# নির্বাচিত দারসে কুরআন

## তৃতীয় খণ্ড

জুনাব আলী ভূঁইয়া

নির্বাচিত

# দারসে কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

# নির্বাচিত দারসে কুরআন

## [তৃতীয় খণ্ড]

জুনাব আলী ভূঁইয়া

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.ahsanpublication.com

# নির্বাচিত দারসে কুরআন-৩

জুনাব আলী ভূঁইয়া

প্রকাশনায়
**আহ্সান পাবলিকেশন**
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০
মোবাইল : ০১৭২৮১১২২০০

ISBN 984-32-1681-5 set



প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৪
রবিউল আউয়াল ১৪৩৫

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার
কম্পোজ
মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহ্মদ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
ঢাকা-১২০৫

**বিনিময় : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র**

---

**Nirbachito Dars-e-Quran 3rd Part** by Junab ALi Bhuiyan and Published by **Ahsan Publication** 38/3 Banglabazar, Dhaka, First Edition February 2014. **Price Tk. 130.00** only.

**AP- 27**

## লেখকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিভিন্ন প্রকার ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তবে আল-কুরআন অধ্যয়নের মজাই আলাদা। দুনিয়ার অন্যসব কিছুতে ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহর কালামে কোনো ভেজাল নেই। তাই আল-কুরআনের বিশুদ্ধ চর্চাই আল্লাহর রেজামন্দি লাভের সহজ সরল পথ বলে আমি মনে করি।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এ পথে একা অগ্রসর না হয়ে আরও কিছু ভাইকে এ পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা দানের উদ্দেশ্যেই এ দারস সিরিজ লিপিবদ্ধ করা হলো।

আমার বইটি যদি পাঠকদের কিছুটা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

আসলে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অধ্যবসায় মানুষকে সাফল্যের পথে নিয়ে যায়। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পর আরও একটি খণ্ড লিখতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদু লিল্লাহ, এরপর আরও একটি খণ্ড রচনার ইচ্ছা পোষণ করি। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা যেন তাওফীক দান করেন।

আমার ছেলেরা প্রকাশনার সাথে জড়িত। তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ পাওয়াতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি তাদের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে মহান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাকে এ কাজে তাওফীক দান করেছেন। এ কাজে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দয়াময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ তা'আলা আমার এবং আমাকে যারা লেখাপড়া শিখিয়ে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন তাঁদের নাজাতের ওসীলা করেন, আমীন ॥

তারিখ : ৪ আগস্ট, ২০০৯

জুনাব আলী ভূঁইয়া
বোয়ালিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।

## সূচিপত্র

# ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর কালাম আল-কুরআন মহা বরকতময় কদরের রাতে প্রথম নাযিল করেন। তারপর মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছর ধরে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআন ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন।

আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন চালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করা হয়েছে। জীবন সমস্যার এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই যার সমাধান আল্লাহ্ পেশ করেননি। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ। এরপর আর কোনো কিতাব অথবা রাসূল মানবজাতির জন্য প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ আর কোনো বিধান আমাদের নিকট প্রেরণ করবেন না।

এই কুরআন জানা, কুরআন মানা ও কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আল-কুরআন অধ্যয়ন, আল-কুরআনের দারস দান, আল-কুরআনের দারস শোনা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

আলহামদু লিল্লাহ্, মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ এ কাজটি অব্যাহতভাবে করছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিপুল অংশই কুরআন জানে না, মানা ও বাস্তবায়ন তো তাদের দ্বারা সম্ভবই নয়। তাই আল-কুরআনের জ্ঞানচর্চা ও মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া মুমিনদের জন্য সর্বপ্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী, তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, "যার অন্তরে আল-কুরআনের কোনো জ্ঞান নেই তা বিরান ঘরতুল্য।" (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে।" (আবু দাউদ, মিশকাত)

## আল-কুরআনের দারস দান পদ্ধতি

১। যে ব্যক্তি দারস দিবেন তার দারস শোনার জন্য অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, বুঝার ক্ষমতা, সুযোগ, ঈমানী চেতনা, চিন্তাশক্তি, দূরদর্শিতা, ব্যস্ততা, চাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাসম্ভব জানা থাকতে হবে।

২। আল-কুরআনের কোন সূরার যে অংশটুকু আপনি দারস দিবেন তার মধ্যে সে অংশের শুদ্ধ তিলাওয়াত, বঙ্গানুবাদ, সূরার পরিচিতি, নামকরণ, মূল বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক পটভূমি, ব্যাখ্যা, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন এ কয়েকটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩। উপরোক্ত পয়েন্টগুলো ছাড়াও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার বাইরেও প্রয়োজনবোধে দারসকে শ্রুতিমধুর করার জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে আরও কিছু পয়েন্ট সংযোজন করা যায়। যেমন দারসের প্রথমে হাম্‌দ ও দরূদ শরীফ, অনুবাদের পর সম্বোধন ও সালাম এবং শেষভাগে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তাওফীক কামনা করে সালামের সাথে সমাপ্তি ঘোষণা।

৪। শ্রোতাদের অবস্থা দেখে তাদের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। শ্রোতাদের যদি ঈমানের দুর্বলতা থেকে যায় তবে আমলের ওয়াজ করলে লাভ হবে না।

৫। দারসের সময়সীমা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সময়ের মধ্যে তিলাওয়াত পাঁচ মিনিট, তরজমা পাঁচ মিনিট, সম্বোধন দুই মিনিট, নামকরণ, সূরা পরিচিতি ও নাযিলের প্রেক্ষাপট সাত মিনিট, ব্যাখ্যা পঁচিশ মিনিট, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন দশ মিনিট নির্ধারণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণগান, তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে দারস শুরু করতে পারেন। যেমন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## দারস : ১

# দলবদ্ধ জীবন যাপন, সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান

### ৩. সূরা আলে ইমরান

**মদীনায় নাযিল : আয়াত-২০০, রুকূ-২০**

**আলোচ্য আয়াত : ১০৪-১০৫।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (١٠٥) وَلاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১০৪) "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) নেকি ও সৎকর্মশীলতার দিকে দাওয়াত দেবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। এ দায়িত্ব যারা পালন করবে তারাই সফলতা লাভ করবে। (১০৫) তোমরা সেসব লোকের মতো হয়ে যেয়ো না যারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।"

**শব্দার্থ :** وَلْتَكُنْ - এবং অবশ্যই থাকবে, مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে, اُمَّةٌ - একদল, يَدْعُوْنَ - যারা ডাকবে, اِلَى الْخَيْرِ - কল্যাণের দিকে, -

يَأْمُرُوْنَ - তারা আদেশ দেবে, بِالْمَعْرُوْفِ - ভাল কাজের দিকে, يَنْهَوْنَ - তারা নিষেধ করবে, عَنِ الْمُنْكَرِ - মন্দ কাজ হতে, أُولٰئِكَ - ঐসব লোক, هُمْ - তারাই, اَلْمُفْلِحُوْنَ - সফলকাম, لاَتَكُوْنُوْا - তোমরা হয়ো না, كَالَّذِيْنَ - তাদের মতো যারা, تَفَرَّقُوْا - বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, اِخْتَلَفُوْا - মতভেদ করেছিল, اَلْبَيِّنٰتُ - সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, عَظِيْمٌ - কঠিন।

**নামকরণ :** এ সূরার ৩৩ নং আয়াতে "আল ইমরান"-এর কথা বলা হয়েছে। এটাই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময় ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ :** নাযিল হওয়ার দিক থেকে সূরাটি চারটি ভাষণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

**১ম ভাষণ– সূরার শুরু থেকে চতুর্থ রুকূর প্রথম দুই আয়াত পর্যন্ত যা বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।**

২য় ভাষণ– চতুর্থ রুকূর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত চলেছে। নবম হিজরীতে নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

৩য় ভাষণ– সপ্তম রুকূর প্রথম থেকে দ্বাদশ রুকূর শেষ পর্যন্ত চলেছে। ভাষণটি ১ম ভাষণের সমসাময়িক কালেই নাযিল হয় বলে মনে হয়।

৪র্থ ভাষণ– ত্রয়োদশ রুকূর শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ওহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়।

**আলোচ্য বিষয়সমূহ :** এ চারটি ভাষণের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্যই ভাষণগুলোকে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে। এ সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি হচ্ছে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) আর অপরটি হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

প্রথম দলটিকে সূরা বাকারার অনুরূপ এ সূরায় আরও অধিক জোরালোভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাদের আকীদার ভ্রান্তি ও নৈতিক ত্রুটির

উল্লেখ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে : এ রাসূল এবং এ কুরআন এমন এক দীনের দিকে আহ্বান করছে যে দীনের দিকে প্রথম থেকে সকল নবী-রাসূল দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। দীনের এ সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা তোমাদের নিজস্ব আসমানী কিতাবসমূহের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই তোমরা এ মহান সত্যকে গ্রহণ করো, যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না।

দ্বিতীয় দল যাদেরকে সর্বোত্তম জাতিরূপে সত্যের ধারক ও পৃথিবীর সংস্কারক হিসেবে দায়িত্বশীল করা হয়েছে, এ সূরায় তাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিক উপদেশ দান করা হয়েছে। অতীতের উম্মতদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরে তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারক জাতি হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলে কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান যারা আল্লাহ্‌র পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সময় তাদের যে দুর্বলতা ধরা পড়েছে তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের সাথে সূরা বাকারার সাদৃশ্য রয়েছে বলেই বাকারার পরেই এ সূরার স্থান স্বাভাবিক।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** (এক) ইসলামে বিশ্বাসীদেরকে সূরা বাকারার পূর্বাহ্নেই যেসব বিপদ-মুসিবত ও অগ্নি পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল তা পূর্ণমাত্রায় তীব্রতাসহকারে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে যদিও ঈমানদারগণ জয়লাভ করেন কিন্তু মূলত এ যুদ্ধ ছিলো ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোড়ার মতো। ইসলামের সাথে যারা শত্রুতা করতো, তারা সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধেই হতচকিত হয়ে গেলো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মনে হচ্ছিল দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনপদটি। হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য এমনিতেই নষ্ট, তার উপর যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিলো।

(দুই) হিজরতের পর নবী করীম (সা) ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, বদরের যুদ্ধকালে সে চুক্তি ভঙ্গ করে আহলে কিতাব তাদের সকল সহানুভূতি মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী সেসব মুশরিকদের প্রদর্শন করেছিল। বদর যুদ্ধের পর ইহুদীরা মদীনার মুনাফিক, কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্ররোচিত করতে থাকে। বনী নযীর গোত্রের নেতা "কাব ইবনে আশরাফ" তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক চেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদীনাবাসীদের সাথে ইহুদীদের শত শত বছরের বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের কোন পরোয়াই তারা করেনি। নবী করীম (সা) ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ "বনী কাইনুকা"-কে পরাভূত করে মদীনা থেকে বের করে দেন। এ কারণে বাকী ইহুদীরা মদীনার মুনাফিক ও হিজাযের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলামের জন্য চারদিকে অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করে, এমনকি নবী করীম (সা)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হতে থাকে। এ সময় থেকে সাহাবীগণ মদীনার নিরাপত্তায় রাতদিন সশস্ত্র পাহারায় থাকতেন।

(তিন) বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। ইহুদীরা তা আরো তীব্রতর করলো। ফলে মাত্র একটি বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি সামরিক বাহিনী মদীনা আক্রমণ করলো। ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা হতে এক হাজার সৈন্য নবী করীম (সা)-এর সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নেতৃত্বে তিন শত সৈনিক মদীনায় ফিরে আসলো। তারপরও মুসলিম সৈনিকদের সাথে মুনাফিকদের ছোট একটি দল ছিলো। যুদ্ধ চলতে থাকাকালেই মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই তারা করেছিল। এ প্রথমবার জানা গেল যে, মুসলমানদের নিজেদের ঘরেই যে এত সংখ্যক আস্ত-শত্রু রয়েছে এবং তারা বহিঃশত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরই ভাই-বন্ধুদের ক্ষতি করতে বদ্ধপরিকর।

(চার) ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সাময়িক পরাজয়ের মূলে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত বেশী। কিন্তু মুসলমানদের দুর্বলতার অংশও কম ছিলো না। মুসলমানদের সৈন্যদলটি, যাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি, তাদের কার্যক্রমে কিছু দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধকালীন সম্পূর্ণ ঘটনাকে সামনে রেখে বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করা এবং এতে মুসলমানদের কার্যক্রমে ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব দুর্বলতা ধরা পড়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। আলোচ্য সূরায় তাই করা হয়েছে। যুদ্ধ অবসানের পর দুনিয়ার সেনাধ্যক্ষগণের সমালোচনা থেকে আল-কুরআনের সমালোচনা যে কত স্বতন্ত্রধর্মী তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

**ব্যাখ্যা :** (ক) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকি ও মঙ্গলের দিকে (মানুষকে) আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে।"

মুসলিম জাতিকে অবশ্যই ভাল কাজের দিকে মানুষকে ডাকতে হবে, মানুষের জন্যে কল্যাণকর বলে জানা সকল প্রকার ভাল কাজের দিকে তারা নির্দেশ দিবে এবং যাবতীয় অন্যায় ও খারাপ কাজ করা থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরার ১১০ নং আয়াতে বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرًا اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

এ জন্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ ক্ষমতা না থাকলে

ভাল কাজ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানানো যায়, কিন্তু মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া যায় না। ভাল কাজের আদেশ দিতে ও মন্দ কাজ বন্ধ করার জন্যে হুকুম করতে গেলে হাতে অবশ্যই ক্ষমতা ও গায়ে শক্তি থাকা আবশ্যক, নতুবা সে নির্দেশ কেউ মানবে না। আর এসব কাজের জন্যে যে ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে জরুরি মনে করে সে কুরআনের আয়াত থেকেই দলীল নেয়। ভাল কাজের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে ক্ষমতার অধিকারী না হলেও কিছু কাজ করা যায়। কিন্তু নিষেধ করার কাজ ক্ষমতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলামী চিন্তা-চেতনার মধ্যে ক্ষমতা চাওয়ার তাৎপর্য এটাই।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তিই কেবল নির্দেশ দিতে বা নিষেধ করতে পারে। অতএব এমন একটি শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন, যারা পৃথিবীতে ভাল কাজের হুকুম ও মন্দ কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে ক্ষমতা লাভ করাকে জরুরি মনে করবে। এ দায়িত্ব যে পালন করবে সে সীসাঢালা একতা শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। সে আল্লাহর সাহায্য পাবে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষমতাও পাবে।

যে শক্তিধরগণ এ দু'টি কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যে কাজ করবে, তারা মানুষের জীবনে আল্লাহর ব্যবস্থা চালু করতে সফল হবে। তবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভাল ও কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো। যার ফলে মানুষ এ সত্য সুন্দর ব্যবস্থার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। "কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার।" অর্থাৎ "তোমরা নিজেরা দোযখের আগুন থেকে বাঁচো এবং পরিবার-পরিজনকেও বাঁচাও।"

তারপর প্রয়োজন শাসন ক্ষমতা, যার মাধ্যমে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া সম্ভব হবে। তখন কল্যাণকর কাজের প্রসার হবে এবং মন্দ কাজ করা থেকে মানুষকে নিষেধ করা যাবে এবং এ সময় মানুষের পক্ষে সে নির্দেশ পালন করাও সহজ হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলছেন– "আমি যে কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ অধিকার দিয়ে দিয়েছি যেন আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তার আনুগত্য

করা হয়। সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা মানে নিছক ওয়ায-নসীহত, আলাপ-আলোচনা বা বিবৃতি দেয়া নয়। অবশ্য সমগ্র কাজের এটি একটা অংশ মাত্র, এর অপর প্রধান অংশ হচ্ছে ক্ষমতাবলে এ ব্যবস্থার আদেশ ও নিষেধগুলোকে চালু করা। যাতে করে মানুষের জীবনে ভাল কাজসমূহ বাস্তবায়িত হয় এবং মন্দ কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

কল্যাণকামী এ দলকে স্বার্থপরতা ও দুশ্চরিত্রতার কবল থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এ দলকে কল্যাণকর কাজে সহায়তা দিতে হবে। এ কল্যাণকামী দলটিতে দলীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা তখনই আসবে যখন দলীয় কর্মীরা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাবে।

সমাজের মানুষের প্রকৃতির দিকে যখন আমরা তাকাই তাদের সহজাত কুপ্রবৃত্তি ও প্রত্যেক মানুষের নিজ ইচ্ছাকে কার্যকর করার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমরা দেখি মানুষের মধ্যে নিজ নিজ সুবিধা ও স্বার্থ হাসিলের এক অন্ধ আবেগ রয়েছে। যখন কারো কারো মধ্যে অহংকার ও প্রাধান্য লাভের নেশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, তখন আমরা গভীরভাবে অনুভব করি 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' আল্লাহর দিকে ডাকা, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা কত কঠিন কাজ।

সমাজে বরাবরই এমন কিছু লোক আছে যারা জোর করে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, অর্থাৎ যুলুমবাজ। রয়েছে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা, আবার রয়েছে হীনমন্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা অন্যায়ভাবে মর্যাদাবান হতে চায়। রয়েছে অতি নরমপন্থী কিছু লোক যারা কোনো ব্যাপারেই শক্ত হতে পারে না। কিছু দুর্বল লোক আছে যারা সুবিচার পায় না, সত্য পরিহারকারী আরও কিছু মানুষ আছে, যারা মজবুত ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে না।

এমনিভাবে সমাজে আরও বহু লোক আছে যারা কল্যাণকর ও ভাল কাজের প্রসার বরদাশত করতে পারে না, বরং অপ্রিয় ও মানবতা বিরোধী কাজে বেশ খুশী হয়। তারা চায় না সবাই সুখে শান্তিতে থাকুক এবং মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ হোক। এমতাবস্থায় নেক চরিত্রের লোকের হাতে নেতৃত্ব দান করাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

ভাল কাজ চালু করা ও মন্দ কাজ বন্ধ করা সমাজের এ দু'টি মৌলিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যে সৎ চিন্তাশীল ও একমনা একদল লোকের প্রয়োজন। তাদের থাকবে আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং রাসূলের আদর্শের আপোসহীন অনুসরণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ। তাহলে এ ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি এবং এর সাথে মহব্বত ও সহানুভূতির অমীয়ধারা একত্রিত হয়ে এ দুনিয়ায় হতাশায় জর্জরিত সমাজের বুকে আবার অনাবিল শান্তি স্থাপিত হবে, যার জন্যে উম্মতে মুসলিমার সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানদেরকে এ দায়িত্ব পালনকেই সাফল্য লাভের চাবিকাঠি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই যারা এ কাজ শুরু করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, "তারাই হচ্ছে সাফল্যমণ্ডিত। সূরা আল আসরে আল্লাহ বলেন–

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

"পরকালে ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।"

মহান আল্লাহ আরো বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তারা প্রকৃত মুসলমান, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে– যার একটি হচ্ছে নামায। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং 'সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।" (সূরা হজ্জ : ৪১)

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন তা সবই আয়াতে উল্লিখিত

'মারূফ' তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পরিচিত'। এসব সৎকর্ম সাধারণের পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়েছে।

(খ) وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের মানুষদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।"

এ পর্যায়ে এসে মুসলিম জামায়াতকে পুনরায় স্মরণ করানো হচ্ছে এবং সতর্ক করতে যেয়ে বলা হচ্ছে, যেন তারা কারো ফাঁদে পা না দেয়। সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। তাদেরকে আবারও সতর্ক করতে যেয়ে বলা হচ্ছে, যেন তারা পথভ্রষ্ট কিতাবধারী ব্যক্তিদের মতো না হয়ে যায় অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টানদের মতো হয়ে না যায়। তারা আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পরও শুধু কুসংস্কার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে দীনের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মাধ্যমে আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছে। যাদেরকে তাদের পূর্বে এক পবিত্র আমানতস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা রক্ষা না করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নানা প্রকার মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, ফলে তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা নেতৃত্বের পতাকা কেড়ে নিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম জামায়াতের হাতে সে পতাকা অর্পণ করেন। আল্লাহ বলছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا ـ

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

সর্বোপরি পরকাল তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে আনন্দের উজ্জ্বলতায় শুভ্র-সমুজ্জ্বল আর কিছু চেহারা থাকবে কালো কুশ্রী-কদাকার। তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, তোমরা কি ঈমানের নেয়ামত লাভ করার পরও কুফরি করেছিলে? সেই কারণেই আজ তোমাদের কুফরির শাস্তিস্বরূপ এ আযাব ভোগ করো। আর যাদের চেহারা থাকবে আনন্দের আবেগে শুভ্র সমুজ্জ্বল, তারা আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে চিরদিন অবস্থান করবে।

**শিক্ষা :** আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৪ ও ১০৫ নং আয়াতের দারস পেশ করার পর এ থেকে যে সকল শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা নিম্নে দেয়া হলো।

১। মানব সমাজের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে, যারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

২। আমরা যদি এ কাজ না করি, তবে আল্লাহ তা'আলা অন্য একদলকে আমাদের স্থলে পাঠিয়ে দিয়ে এ কাজ চালিয়ে নেবেন, আমরা বঞ্চিত হয়ে যাবো এবং তারাই সফলতা লাভ করবে।

৩। ঈমানদার লোকেরা মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলে সেদিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর দুনিয়ায় তাদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

৪। আল্লাহর রশি একতাবদ্ধ হয়ে মজবুতভাবে ধারণ করলে বিচ্ছিন্ন না থেকে একতাবদ্ধ হলে সফলতা লাভ করা সম্ভব।

**বাস্তবায়ন :** মানব সমাজের মধ্যে আমরা যারা ঈমানদার বলে দাবী করি, তারা অবশ্যই "আমর বিল মারূফ" ও "নাহি আনিল মুনকার"-এর দায়িত্ব পালন করে ইসলামী সমাজ গঠনে তৎপর হতে পারি। এ কাজের দ্বারাই আমরা আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কাজে তাওফীক দান করুন, আমীন ॥

## দারস : ২

# অন্যদের ভালো কাজের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে নিজেও ভালো কাজ করতে হবে

### ২. সূরা আল বাকারা

**মদীনায় নাযিল : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০**

**আলোচ্য আয়াত : ৪৪, ৪৫ ও ৪৬।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٤٤) اَتَاْمُـــرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِـــرِّ وَتَـنْسَـوْنَ اَنْفُـسَكُـمْ وَاَنْـتُـمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. (٤٥) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْـرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْـرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ. (٤٦) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৪৪) "তোমরা কি মানুষদের ভাল কাজের আদেশ করো, কিন্তু নিজেদের (জীবনে তা বাস্তবায়নের) কথা ভুলে যাও অথচ তোমরা সবাই আল্লাহর কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? (৪৫) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিঃসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়, (৪) যারা মনে করে সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের প্রতিপালকের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"

**শব্দার্থ :** اَتَاْمُرُوْنَ - তোমরা নির্দেশ দিচ্ছ কি? اَلنَّاسَ - লোকদের, بِالْبِرِّ - নেকীর, تَنْسَوْنَ - তোমরা ভুলে যাচ্ছো, اَنْفُسَكُمْ - তোমাদের

নিজেদেরকে, اَنْتُمْ - তোমরা, تَتْلُوْنَ - তিলাওয়াত করো, اَفَلَا - না তবে কি, تَعْقِلُوْنَ - তোমরা বুঝো, اسْتَعِيْنُوْا - তোমরা সাহায্য চাও, بِالصَّبْرِ - ধৈর্যের সাথে, اَلصَّلٰوةِ - নামাযের মাধ্যমে, اِنَّهَا - তা নিশ্চয়ই, لَكَبِيْرَةٌ - অবশ্যই বড় কঠিন, اَلْخٰشِعِيْنَ - আল্লাহভীরুদের (কঠিন নয়), اَلَّذِيْنَ - যারা, يَظُنُّوْنَ - বিশ্বাস করে, اَنَّهُمْ - তারা নিশ্চয়, مُلٰقُوْا - সাক্ষাৎকারী, رَبِّهِمْ - তাদের রবের সাথে, اِلَيْهِ - তারই দিকে, رَاجِعُوْنَ - প্রত্যাবর্তনকারী।

**নামকরণ :** এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লিখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামতস্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আল বাকারা সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই।

**নাযিল হওয়ার সময়কাল :** এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ মাদানী জিন্দেগীর প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ আয়াতগুলো তাঁর জিন্দেগীর একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়। যে আয়াতগুলো দ্বারা সূরার সমাপ্তি হয়েছে, সেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ক্রমধারার সাথে মিল রেখেই এভাবে সাজানো হয়েছে।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে না নিলে এ সূরাকে সহজে বুঝা সম্ভব হবে না।

(১) হিজরতের পূর্বে ইসলামী দাওয়াতের কথা সাধারণত মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাদের নিকট ইসলামের এই বাণী ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। হিজরতের পর ইসলামের দাওয়াত ইহুদীদের সম্মুখীন হলো। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী হয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ওহী ও ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিলো। বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তাওরাতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার সাথে মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। তারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো প্রকার সংস্কার সংশোধন নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হতো তবে তারা তাঁকে দুশমন মনে করে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত সহস্র বছর ধরে এই একই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে।

দীন বহির্ভূত বিষয়গুলো দীনের মধ্যে শামিল, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। মুসলিম নাম ভুলে গিয়ে নিছক ইহুদী নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ধরে রেখেছিল। ১৫ ও ১৬ রুকূতে ইহুদীদের সমালোচনা করে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পেশ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

(২) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের একটি নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতির প্রচার এবং দীন গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিলো।

হিজরতের পর মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ জারী করতে থাকেন। ইসলামের ভিত্তির উপর নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পন্থাও বলে দিলেন।

(৩) হিজরতের পূর্বে কাফেরদের ঘরেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছিল। যেসব লোক দাওয়াত গ্রহণ করছিল, তারা নিজ নিজ স্থান থেকেই দাওয়াতী কাজ করতো এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম-পীড়ন ভোগ করতো। কিন্তু হিজরতের পর বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণ যখন একত্র হয়ে ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, তখন একদিকে এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সমগ্র আরবদেশ একত্র হয়ে তার ধ্বংসের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। তখন এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাবিশিষ্ট দলের সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করতে লাগলো প্রধানত পাঁচটি কাজের উপর।

এক– পূর্ণ শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ইসলামের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই– বিরোধীরা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, বিষয়টি তাদের এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোনো বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

তিন– তারা আশ্রয়হীন, প্রবাসী ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার দরুন দারিদ্র্য, উপবাস এবং সর্বদা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অস্বস্তিকর অবস্থার শিকার হয়েও হতাশ না হয়ে পূর্ণ ধৈর্যসহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করে এবং তাদের সংকল্পে কোনোরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে দেয় না।

চার– ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে কোনো দিক থেকে সশস্ত্র আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বিরোধী পক্ষের জনসংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

পাঁচ– ঈমানদারদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সাহস ও হিম্মত জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে আরববাসীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে আপোসে গ্রহণ করতে না

চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলী ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তা'আলা এই পাঁচটি কাজের প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে মুনাফিকের দল আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। নবী করীম (সা)-এর মক্কী জিন্দেগীর শেষের দিকে মুনাফিকির প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) মক্কার মুনাফিকের স্বরূপ ছিলো এমন– তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু ইসলামের খাতিরে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিলো না। মদীনায় আসার পর আরও অনেক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী মুনাফিক দল ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দলে প্রবেশ করতো।

(খ) দ্বিতীয় মুনাফিক দলের অবস্থা এই ছিলো যে, ইসলামী কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের অংশ ভোগ করতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও রক্ষা পেতো।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিলো। তাদের বংশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তারাও বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করতো, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করে ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাদের মন চাইতো না।

মহান আল্লাহ এই সূরায় তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী কালে তাদের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

**আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু :** কিতাব পাঠকারীগণকে আল্লাহ সতর্ক করছেন এ বলে, তোমরা অন্যদেরকে সৎপথে চলার উপদেশ দাও, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি কি কাজে লাগাও না? মুমিনদেরকে সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ বলেন, সন্দেহাতীতভাবে নামায অতি কঠিন কাজ। কিন্তু অনুগত বান্দাদের জন্য মোটেই কঠিন নয়, যারা মনে প্রাণে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির কথা স্বীকার করে।

**ব্যাখ্যা :** (ক) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

"তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার কথা বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? তোমরা সবর ও নামায সহকারে সাহায্য চাও।"

কথা ও কাজের এবং আদর্শ ও চরিত্রের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য অর্জিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এটা অর্জন করতে প্রচুর চেষ্টা সাধনা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। আর সে সাথে প্রয়োজন আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ রক্ষা করা এবং তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও হিদায়াতের প্রার্থনা করা। কেননা নিত্যদিনের কর্মব্যস্ততা, কর্মক্ষেত্রের নানা রকম বাধ্যবাধকতা ও বৈষয়িক প্রয়োজনের নিত্যনতুন চাহিদা অনেক সময় মানুষকে বাস্তব জীবনে তার মনোনীত আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাস থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। যে নীতি ও বিধানের প্রতি সে অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে, নিজের জীবনে তার প্রতিফলনে সমর্থ হয় না।

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যত ক্ষমতাধরই হোক না কেন, মহাশক্তিশালী চিরঞ্জীব সত্তার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সে দুর্বল ও অক্ষমই থেকে যাবে। অপর দিকে অন্যায় ও অসত্যের আগ্রাসী শক্তিসমূহ তার চেয়ে অনেক বড় ও পরাক্রমশালী। সে শক্তিগুলোকে কোনো কোনো সময় সে পরাজিতও করতে পারে। আবার কোনো দুর্বল মুহূর্তের পদস্খলনে সে পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে। ফলে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই সে এক নিমিষে হারিয়ে

ফেলতে পারে। সুতরাং সে যদি সর্বশক্তিমান, পরাক্রান্ত, চিরঅজেয় মা'বুদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে, তার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে সে নিজের সকল দুর্বলতা, কামনা-বাসনা, প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা জয় করতে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে। যেসকল পার্থিব শক্তি তাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে তাদেরকেও সে বশে আনতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ م بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا ـ "যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনও ছিন্ন হয় না।"

আল কুরআনে প্রত্যক্ষভাবে ইহুদীদেরকে এবং পরোক্ষভাবে দুনিয়াবাসীকে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। আল কুরআনের এ অংশ নাযিলের সময় ইহুদীরা তাঁর মুখোমুখি ছিলো বলেই তাদের প্রতি ছিলো তাঁর এ নির্দেশ। মদীনাতে তারা যে কেন্দ্রীয় পদমর্যাদার অধিকারী ছিলো তার বিনিময়ে হলেও তাদেরকে তাদের চির পরিচিত সত্যকে গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেরূপ তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও তৎপরতার বিনিময়ে প্রাপ্য পার্থিব সুবিধা অথবা সমগ্র দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সংগঠনে যোগ দিতে বলা হয়েছে, বিশেষত তারা নিজেরাই যখন অন্যদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে থাকে। অবশ্য এ কাজ মোটেই সহজ নয়। এ জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাহস, মনোবল ও একমুখী হওয়া প্রয়োজন। আর সে সাহস ও মনোবল নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এর সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করলে এ কঠিন পথ পাড়ি দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সবর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা দেয়া, বিরত রাখা ও বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির আশা আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বুঝায়, যার ফলে এক ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলীর মুকাবিলায় নিজের হৃদয় ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে

ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে আল্লাহর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ নৈতিক গুণটিকে নিজের মধ্যে লালন করা এবং বাইরে থেকে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত নামায পড়া।

(খ) وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ لا الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. - "নিঃসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়, যারা মনে করে সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে তাদের ফিরে যেতে হবে।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত নয় এবং আখিরাত বিশ্বাস করে না, তার জন্য নিয়মিত নামায আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ ধরনের আপদে সে কখনও নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দ্যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভুর সামনে হাজির হবার কথা চিন্তা করে, তার জন্য নামায আদায় করা নয়, নামায ত্যাগ করাই কঠিন।

নামায হলো আল্লাহ্ তা'আলা ও তার বান্দার মধ্যে মিলন ঘটানোর অন্যতম মাধ্যম। এটা এমন একটা যোগসূত্র যা থেকে মন শক্তি আহরণ করে, আত্মা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক বন্ধন অর্জন করে এবং মানস-সত্তাও উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান এক পাথেয় লাভ করে। রাসূল (সা) যখনই কোনো বিপদের সম্মুখীন হতেন তখনই নামাযের আশ্রয় নিতেন। নামাযই হলো আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে সবচেয়ে শক্ত ও অটুট যোগসূত্র।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - 'নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।' এটা মানুষের আত্মা ও বিবেককে ওহী ও প্রজ্ঞার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে। মুমিন যখনই আল্লাহর পথের পাথেয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে, মধ্যাহ্নের ঝলসানো খরতাপে তপ্ত পিপাসার্ত হয়ে যখনই পানির জন্যে ছটফট করবে, সকল সাহায্য থেকে রিক্ত ও বঞ্চিত হয়ে যখনই আল্লাহর সাহায্যের জন্যে হাহুতাশ করবে এবং সকল সঞ্চিত সম্বল নিঃশেষ হয়ে গেলে যখনই দেউলিয়া হয়ে সম্বলের

প্রত্যাশী হবে, তখন এ নামাযই তার হতাশা দূর করে মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের উৎস হয়ে দাঁড়াবে। এ উৎস থেকে মুমিন ব্যক্তি চিরদিনই উপকৃত হতে সক্ষম।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের অনিবার্যতায় বিশ্বাস রাখা এবং সকল ব্যাপারে এ বিশ্বাসে অবিচল থাকা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীরু তার একমাত্র উৎস। দুনিয়া ও আখিরাতের যথার্থ মূল্যমান নিরূপণও এর উপরই নির্ভরশীল। এ মূল্যমান নিরূপণের মানদণ্ড যখন নির্ভুলভাবে কাজ করবে তখন যথার্থই দেখা যাবে গোটা দুনিয়া একটা নগণ্য তুচ্ছ বস্তু। তখন আখিরাত তার আসল রূপ নিয়ে দেখা দেবে। তখন কোনো বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন মানুষ আখিরাতকে অগ্রগণ্য মনে করে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। এখানে প্রাথমিকভাবে যদিও বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু কুরআনকে সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, এই নির্দেশ আসলে সকল যুগের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

**শিক্ষা :** ১। জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী হচ্ছে, অন্যকে ভাল কাজের আদেশ করার সাথে সাথে নিজেও সেটি করা। তা না হলে জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও কাজে লাগানো হলো না।

২। ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

৩। নিশ্চয়ই নামায একটি কঠিন কাজ। কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে নামায আদায় করে।

৪। নামায হলো অসহায়ের সম্বল, অন্তিম কালের সান্ত্বনা ও বিপদের বন্ধু।

**বাস্তবায়ন :** সূরায়ে বাকারার এ তিনটি আয়াতের দারস থেকে আমরা যে শিক্ষাগুলো পেলাম, সেগুলো ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।

## দারস : ৩

# গীবতকারী ও কৃপণ ব্যক্তির জন্য চূর্ণ-বিচূর্ণকারী দোযখ

## ১০৪. সূরা হুমাযাহ্

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-৯, রুকূ-১**

আলোচ্য : পূর্ণ সূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ. كَلاَّ لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ. فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) "ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা-সামনি) লোকদের উপর গালাগাল এবং (পেছনে-পেছনে) দোষ প্রচারে অভ্যস্ত। যে অর্থ জমায় এবং তা গুনে গুনে রাখে। সে মনে করে যে, তার ধন সম্পদ চিরকাল তার সঙ্গে থাকবে। কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত করা হবে। আর তুমি কি জানো সে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? এটা আল্লাহর আগুন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত, যা হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তা তাদের উপর ঢেকে দিয়ে (এমনভাবে) বন্ধ করা হবে যে, উঁচু উঁচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত করা হবে)।"

**শব্দার্থ :** وَيْلٌ - ধ্বংস, لِّكُلِّ - প্রত্যেকের জন্য, هُمَزَةٍ - যে সামনা সামনি ধিক্কার দেয়, لُّمَزَةِ - পেছনে নিন্দা করে বেড়ায়, جَمَعَ - জমা করে, مَالاً - মাল, عَدَّدَهٗ - তা গুনে গুনে রাখে, يَحْسَبُ - সে ধারণা করে, اَنَّ

- নিশ্চয়, مَالَهُ - তার মাল, اَخْلَدَهُ - তার কাছে চিরকাল থাকবে, كَلَّا - কখনো নয়, لَيُنْبَذَنَّ - তাকে অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে, اَلْحُطَمَةِ - চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে (জাহান্নামে), وَمَا اَدْرٰكَ - আর (হে রাসূল!) আপনি জানেন কি, نَارُ - আগুন, الْمُوْقَدَةُ - প্রজ্বলিত, الَّتِىْ - যা, تَطَّلِعُ - পৌঁছবে, الاَفْئِدَةِ - আত্মা, اِنَّهَا - নিশ্চয় এটা, عَلَيْهِمْ - তাদের উপর, مُّؤْصَدَةٌ - ঘিরে রাখবে, عَمَدٍ - খুঁটি বা স্তম্ভ, مُّمَدَّدَةٍ - লম্বা লম্বা।

**নামকরণ :** প্রথম আয়াতের তৃতীয় শব্দ هُمَزَةٍ থেকে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। هُمَزَةٍ - অর্থ সামনা সামনি গালাগাল করা।

**নাযিলের স্থান ও সময়কাল :** মুফাস্‌সিরগণ একমত যে, সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। সূরার মূলবক্তব্য, বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গি থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। সূরা 'আল কিয়ামাহ'-এর পরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

**মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু :** লোকদেরকে হেয় প্রতিপন্নকারী, গীবতকারী ও চোগলখোর এবং অর্থপূজারী ধনী লোকদের কলুষ চরিত্র এবং তার যোগ্য শাস্তির ঘোষণাই এই সূরাটির মূলবক্তব্য।

যারা লোকদেরকে সামনা-সামনি হেয় প্রতিপন্ন করে, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত হেনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং পশ্চাতে অপবাদ রটায়, গীবত ও চোগলখোরী-কূটনামী করে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এসব চারিত্রিক দোষে আক্রান্তদের জন্য রয়েছে চরম সর্বনাশ ও নিশ্চিত ধ্বংস। যে বিপুল অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং তার প্রতি মহব্বত ও গর্বের কারণে গুনে গুনে হিসাব কষতে থাকে তার জন্য ধ্বংসের আগাম সংবাদ শুনানো হয়েছে। সে নিশ্চিত মনে করে যে, তার এ সঞ্চিত ধন সম্পদ চিরকাল তার সঙ্গে থেকে তাকে অমর করে রাখবে। আসলে তার সঞ্চিত সম্পদরাশিকে পেছনে ফেলে রেখে যেতে হবে। সম্পদ তাকে অমর করে রাখতে পারবে না।

অতঃপর নিক্ষিপ্ত হবে সে এমন এক জাহান্নামে, যেখানে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, এ চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? উত্তরে আল্লাহ স্বয়ং ইরশাদ করেছেন : এটাতো প্রজ্বলিত আগুন, যা মানুষের অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। সেখান থেকে পালানোর সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হবে।

ব্যাখ্যা : (ক) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. - "ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা-সামনি) লোকদের উপর গালাগাল এবং (পেছনে-পেছনে) দোষ প্রচারে অভ্যস্ত।"

هَمْزٌ-এর বহুবচন হলো هُمَزَةٌ - অর্থ হলো সামনা সামনি নিন্দা করা। সম্মুখে গালাগালি করে একজনের সম্মানকে অন্যদের সামনে নষ্ট করে তার মান-মর্যাদায় আঘাত করাটা জায়েয নেই। কোনো ক্রটি কারোর মধ্যে দেখা গেলে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে সংশোধনের জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দেয়া উত্তম। একজন মুমিন অপর মুমিনের আয়নাস্বরূপ। কোনো মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার আত্মসম্মানে আঘাত হানাকে মহানবী (সা) অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ বলে অভিহিত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নকল ক্রেতা সেজে দাম বাড়াবে না, পরস্পরে ঘৃণা-বিদ্বেষ করো না, একে অপরের পিছু লেগে থেকো না, অন্যের জিনিস বিক্রয়কালে নিজের জিনিস তার সামনে তুলে ধরো না। তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে সহায়-সঙ্গীহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবে না, তার সাথে মিথ্যা বলবে না ও তাকে অপমান করবে না।" (মুসলিম)

আবু বকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে কুরবানীর দিন মিনাতে তাঁর ভাষণে বলেন : "তোমাদের পরস্পরের রক্ত, মাল-সম্পদ এবং মান-ইজ্জত পরস্পরের নিকট হারাম ও সম্মানযোগ্য, যেমনভাবে আজকের এ দিন, এ মাস, এ শহর তোমাদের নিকট হারাম ও সম্মানযোগ্য।" (বুখারী, মুসলিম)

দাম্ভিক, অহংকারী লোক সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ (সা) সতর্ক করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও অহংকার আছে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো– লোকেরা চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, জুতা আকর্ষণীয় হোক, এটা কি অহংকারের লক্ষণ? রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে– গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছজ্ঞান করা।" (মুসলিম)

لُمَزٌ-এর বহুবচন হলো لُمَزَةٌ - পেছনে দোষ বর্ণনা করে বেড়ানো, যাকে গীবত বলা হয়। ব্যক্তির মধ্যে যদি দোষ না থাকে তবে তাকে বুহতান বলা হয়। বুহতান পুরোপুরি হারাম। গীবত তিন জায়গায় করা জায়েয। (ক) সংশোধনের উদ্দেশ্যে অভিভাবকের নিকট। (খ) তার অনিষ্ট হতে সমাজ, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার নিয়তে। (গ) বিচারকের নিকট ন্যায় বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে দোষ বর্ণনা করা যায়।

'হুমাযা ও লুমাযা' যে অঙ্গের মাধ্যমে সাধিত হয় তা হচ্ছে জিহ্বা। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ. - "যে অর্থ জমায় এবং তা গুনে গুনে রাখে। সে মনে করে যে তার ধন সম্পদ চিরকাল তার সঙ্গে থাকবে।"

جَمَعَ مَالاً - সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত লালসা-মহব্বত, কার্পণ্যের আতিশয্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, অহংকার ও লালসার কারণে বারংবার সেগুলো গণনা করে রাখা। একদিন তাকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে, সে কথাটি কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তেও তার মনে আসে না।

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ. وَمَاۤ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ - "কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত করা হবে। আর তুমি কি জানো সে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি?"

حُطَمَةَ নামক দোযখে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। নিজে ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর আগুন যা প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত, তাতে সে নিক্ষিপ্ত হবে। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল যেখানে সে কুমন্ত্রণা উৎপত্তি হয়, সেখানে সে আগুন গিয়ে পৌছবে।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ. فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. - "এটা আল্লাহর আগুন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত, যা হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তা তাদের উপর ঢেকে দিয়ে (এমনভাবে) বন্ধ করা হবে যে উঁচু উঁচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত করা হবে)।"

مُّؤْصَدَةٌ - ঢেকে দেয়া হবে। এটা তাদের উপর এমনভাবে ঢেকে দেয়া হবে যা عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে। ঢাকনাটির চতুর্পার্শ্বে উঁচু উঁচু স্তম্ভ পেরেকের মতো গেঁড়ে দেয়া হবে, যাতে আগুনের তেজ পুরোপুরি কাজে লাগে, বের হয়ে যেতে না পারে। প্রয়োজন মতো দোযখীদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হবে।

اَلاَفْئِدَةَ বহুবচন। একবচনে فُؤَادٌ অর্থাৎ দিল বা অন্তঃকরণ। বুকের ভেতর সদা স্পন্দনশীল হৃৎপিণ্ডকে ফুয়াদ বলে না বরং মানুষের চিন্তা-চেতনা, কামনা-বাসনা আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আকীদা-বিশ্বাসের উৎসই হলো ফুয়াদ (فُؤَادٌ)।

দুনিয়ার আগুনের স্পর্শে মানুষের চেতনা হারিয়ে যায়, মৃত্যুবরণ করে কিন্তু আখিরাতে জাহান্নামের আগুন 'ফুয়াদ' স্পর্শ করবে। কারণ তখন তার আর মৃত্যু হবে না। সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে মানুষ মৃত্যুই কামনা করে। সূরা ইনশিকাকের ১১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন– فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا -

অর্থ : "অতঃপর সে অবশ্যই মৃত্যুকে আহ্বান জানাতে থাকবে।"

সূরা আ'লার ১৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ

অর্থ : 'সেখানে (জাহান্নামে) সে মরবেও না, আর (আরামে) বেঁচেও থাকবে না।'

**অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ায় কৃত অপরাধের জন্য জাহান্নামের আযাব পূর্ণ অনুভূতিশীল 'ফুয়াদ'-কে আস্বাদন করাবেন।**

**শিক্ষা :** চরিত্র সংশোধনের জন্য কয়েকটি মৌলিক হাতিয়ার এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) দাম্ভিক, অহংকারী ও ক্ষমতা লোভী ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত দুর্বলদেরকে লোকসমক্ষে কটাক্ষ, হেয় প্রতিপন্ন, ঘৃণা-বিদ্বেষ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও গালাগালি করে আর পশ্চাতে গীবত, চোগলখোরীও অপবাদ দেয়। মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে গীবতের তুলনা করা হয়েছে। (হুজুরাত, ১২ আয়াত)

(খ) সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত লালসা-মহব্বত, কৃপণতা করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য বার বার গণনা করে রাখা। সে মনে করে যে এ সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করবে। আসলে কিন্তু তা নয়, অতিশীঘ্রই সে হুতামা নামক দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। সে হুতামা দোযখের আগুন যা প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত, এটা কুমন্ত্রণার উৎসস্থান তার অন্তঃকরণ পর্যন্ত স্পর্শ করবে।

**বাস্তবায়ন :** আমাদের সমাজে চরিত্র ধ্বংসের এসব হাতিয়ার বিদ্যমান। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিজের জীবন ও সমাজ থেকে এসব দোষ-ত্রুটি উৎখাত করার চেষ্টা করতে হবে। আর এ কাজের মাধ্যমে আমরা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, আল্লাহ তুমি সে তাওফীক দাও। আমীন। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।

**দারস : ৪**

# অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ও ওহী সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণার অপনোদন

## ৩৬. সূরা ইয়াসিন

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-৮৩, রুকূ-৫**

**আলোচ্য আয়াত : ৬৫-৭০**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٦٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. (٦٦) وَلَوْ نَشَآءُ
لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى
يُبْصِرُوْنَ. (٦٧) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ
فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ. (٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ
نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ. (٦٩) وَمَا عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ.
(٧٠) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৬৫) আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, আর এদের পা'গুলো সাক্ষ্য দেবে যে, এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে। (৬৬) আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে

চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে? (৬৭) আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো। (৬৮) যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ জীবন দেই, তার দেহ সংগঠনকেই আমি বদলিয়ে দেই (এ অবস্থা দেখে) তাদের বোধোদয় হয় না? (৬৯) আমি তাঁকে (নবী) কবিত্ব শিখাইনি, কাব্য চর্চা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। এতো একটি উপদেশ ও পরিষ্কার পাঠযোগ্য কিতাব। (৭০) যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

**শব্দার্থ :** اَلْيَوْمَ - আজ, نَخْتِمُ - মোহর হয়ে যায়, اَفْوَاهِهِمْ - তাদের মুখগুলোর, تُكَلِّمُنَا - আমাদের সাথে কথা বলবে, اَيْدِيْهِمْ - তাদের হাতগুলো, تَشْهَدُ - সাক্ষ্য দিবে, اَرْجُلُهُمْ - তাদের পা'গুলো, بِمَا - ঐ বিষয়ে যা, كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - তারা অর্জন করছিল, وَلَوْ - এবং যদি, لَطَمَسْنَا - আমরা নিভিয়ে দিতে পারি, اَعْيُنِهِمْ - তাদের চক্ষু দীপগুলোকে, فَاسْتَبَقُوْا - তারা অগ্রসর হউক, الصِّرَاطَ - পথে, فَاَنّٰى - তখন কোথা হতে, يُبْصِرُوْنَ - তারা দেখতে পাবে, وَلَوْ - এবং যদি, نَشَاءُ - আমরা চাই, لَمَسَخْنٰهُمْ - তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিকৃত করে দিতে পারি, مَكَانَتِهِمْ - তাদের (নিজ নিজ) স্থানের। فَمَا - অতঃপর না, اسْتَطَاعُوْا - তারা সমর্থ হবে, مُضِيًّا - আগে যেতে, يَرْجِعُوْنَ - পেছনে ফিরতে, نُعَمِّرْهُ - যাকে আমরা দীর্ঘায়ু দেই, نُنَكِّسْهُ - তার জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগায়, عَلَّمْنٰهُ - তাকে আমরা শিখিয়েছি, اَلشِّعْرَ - কবিতা, يَنْۢبَغِىْ - শোভা পায়, ذِكْرٌ - নসীহত, مُبِيْنٌ - সুস্পষ্ট, لِيُنْذِرَ - সতর্ক করে যেন, حَيًّا - জীবিত, يَحِقَّ - প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, الْقَوْلُ - বাণী।

**নামকরণ :** পৃথক দু'টি হরফ يس দিয়ে এ সূরার সূচনা করা হয়েছে, এ দু'টি হরফকেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিল হওয়ার সময়কাল :** সূরা বর্ণনার লক্ষণ অনুযায়ী অনুভব করা যায় যে, নবী করিম (সা) এর নবুয়ত লাভের পর মক্কী জিন্দেগীর শেষভাগে এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে।

**মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু :** শেষ বিচারের দিন যে সকল অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যুক বলবে এবং আমলনামাকেও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফায়সালা দেয়া হবে, আল্লাহ বলবেন, তোমাদের বাজে কথা বন্ধ করো। এখন দেখো তোমাদের আপন শরীরের অংশ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমাদের কৃত-কর্মের কি বর্ণনা দেয়? এ প্রসঙ্গে এখানে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সূরায় তাদের চোখ, কান, জিহ্বা ও শরীরের চর্ম– তাদের দিয়ে যে কাজ করানো হয়েছে, তাদের পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে দেবে সেটা জানানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত ব্যক্তির আকৃতিকে বদল করে আমি শিশুদের মতো করে দেই। অন্যের সহায়তা ব্যতীত তারা উঠাবসা করতে পারে না। যে ধরনের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবন শুরু হয়েছিল, জীবনের শেষপ্রান্তে প্রায় সে একই অবস্থায় পৌছে যায়।

কাফিরেরা তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, মৃত্যুর পরের জীবন জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে নবী (সা) এর কথাকে নিছক কাব্য কথা গণ্য করে নিজেরা তাকে গুরুত্বহীন করে দেয়ার যে প্রচেষ্টা চালাতো, এখানে তারই জবাব দেয়া হয়েছে।

জীবন বলতে চিন্তাশীল, বিবেকবান মানুষকে বুঝানো হয়েছে। যার অবস্থা পাথরের মতো নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নয়। তার সামনে যতই যুক্তিসহকারে উপদেশ পেশ করা হোক না কেন, সে কিছুই শোনে না, বুঝে না এবং নিজের স্থান থেকে একটুও নড়ে না।

ব্যাখ্যা : (٦٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

(৬৫) "আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, আর এদের পা'গুলো সাক্ষ্য দেবে যে, এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।"

আল্লাহর আদালতে অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে। সাক্ষীদেরকে মিথ্যুক বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতা মেনে নেবে না। তাদের ব্যাপারে এ ফায়সালা দেয়া হবে যে, তোমাদের বাজে কথা বন্ধ করো। এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়। এখানে কেবল হাত পায়ের সাক্ষ্য দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে তাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং চর্মও তাদেরকে দিয়ে যে কাজ করানো হয়েছে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে দেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (سورة النور : ٢٤)

"তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায়, যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত, পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা নূর : ২৪)

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ্ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অপরদিকে সূরায়ে নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ্য দেবে– এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ্যদান হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদেরকে কোন্ কোন্ কাজে লাগিয়েছে, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরি কথা বলেছিল, কোন্ ধরনের মিথ্যা আচরণ করেছিল, কত প্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল

এবং কোন্ কোন্ সময় তাদের মাধ্যমে কোন্ কোন্ কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে।

حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (سورة حم السجده : ٢٥)

"পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দেবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করেছিল।" (সূরা হা-হীম-আস-সাজদাহ : ২৫)

বিভিন্ন হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা এসেছে তা হচ্ছে, যখন কোনো একগুঁয়ে অপরাধী তার অপরাধসমূহ অস্বীকার করতে থাকবে এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকেও অস্বীকার করতে তৎপর হবে, তখন আল্লাহর আদেশে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এক এক করে সাক্ষ্য দেবে, সে ঐগুলোর সাহায্যে কি কি কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। হযরত আনাস (রা), হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ বিষয়টি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে জরীর, ইবনে আবু হাতিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

(٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوْا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ.

(٦٧) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ.

(৬৬) "আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে?"

(৬৭) "আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো।"

উপরের আয়াতদ্বয়ে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা কেবল শাস্তিই নয়; বরং তা এক ধরনের বিদ্রূপ এবং উপহাসও। সত্যকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং যারা উপহাস করে বলতো, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো, সে ওয়াদা করা আযাব কখন আসবে' তাদের এখন উপহাস করা হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্যে আমরা অপরাধীদের দৃষ্টিশক্তি রহিত অবস্থায় দেখতে পাই। এ অবস্থায়ও তারা জান্নাতের পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে ভিড় জমাবে, হুড়াহুড়ি করবে, কিন্তু বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, অন্ধের ন্যায় হাতড়াতে থাকবে। কারণ তারা তো কিছুই দেখতে পাবে না। তাদের দৃষ্টি শক্তিতো ছিনিয়ে নেয়া হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা এসব অপরাধীদের নিজ নিজ জায়গায় পাথরের মূর্তির ন্যায় অনড় ও স্থবির দেখতে পাই। নড়াচড়া করার মতো শক্তি তাদের নেই। অথচ এ কিছুক্ষণ আগেও তারা দৌড়াদৌড়ি করেছে, হুড়াহুড়ি করেছে।

দু'টো দৃশ্যেই এদের খেলনা বা পুতুলের মতো মনে হবে, তাদের এ জাতীয় দৃশ্য হাসি তামাশার সৃষ্টি করবে।

অথচ এরাই এককালে আল্লাহর ওয়াদা করা আযাবের বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মস্করায় লিপ্ত ছিলো।

(٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ط اَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.

(৬৮) "যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার আকৃতিকে আমি একেবারেই বদলে দেই। (এ অবস্থা দেখে কি) তাদের বোধোদয় হয় না?"

আকৃতি বদলে দেয়ার মানে হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ মানুষের অবস্থা শিশুদের মতো করে দেন। ঠিক শিশুদের মতোই তারা চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের উজ্জ্বল দেহায়ব সুন্দর চামড়ার রং বদলে যায়, চামড়া ঢিলা হয়ে যায়, চেহারা ভেঙ্গে যায়। দেখলে কঙ্কালের মতো মনে হয়। অন্যেরা তাদেরকে উঠাতে বসাতে সহায়তা দিয়ে চলাফেরা করাতে থাকে। অন্যেরা তাদেরকে পানাহার করায়। তারা নিজেদের কাপড়ে ও

বিছানায় পেশাব করে দেয়। বালকসুলভ কথা বলতে থাকে, যা শুনে লোকেরা হেসে উঠে। মোটকথা যে ধরনের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে তারা দুনিয়ার জীবন শুরু করেছিল, জীবন সায়াহ্নে প্রায় সে একই অবস্থায় পৌঁছে যায়।

(٦٩) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ.

(৬৯) "আমি এ (নবী)কে কবিতা শেখাইনি এবং কাব্য চর্চা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। এতো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব।"

কাফিররা তাওহীদ, আখিরাত, মৃত্যুর পরের জীবন ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে নবী (সা)-এর কথাকে নিছক কাব্যকথা গণ্য করে নিজেরা তাকে গুরুত্বহীন করে দেবার যে প্রচেষ্টা চালাতো, এখানে তারই জবাব দেয়া হয়েছে।

(٧٠) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

(৭০) "যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"

জীবন বলতে চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বুঝানো হয়েছে। যার অবস্থা পাথরের মত নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নয়। আপনি তার সামনে যতই যুক্তি সহকারে হক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনা করেন না কেন এবং যতই সহানুভূতিসহকারে তাকে উপদেশ দেন না কেন সে কিছুই শোনে না, বুঝে না এবং নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়ে না। তারা জীবনী শক্তি থেকে বঞ্চিত, তারা মৃত। তাদের জানা উচিত, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা চূড়ান্ত; আল্লাহর আযাব তাদের ক্ষেত্রে অবধারিত। আল কুরআনের ক্ষেত্রে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। উপরে এক দলের কথা বলা হলো। আর দ্বিতীয় হলো যারা কুরআনের আহ্বানে সাড়া দেয়। সুতরাং তারা জীবনী শক্তির অধিকারী। তারাই সরল পথের যাত্রী এবং আল্লাহর নিয়ামত ও পুরস্কারে ধন্য হবে।

**শিক্ষা :** ১। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের নিজের অধীনস্থ হাত, পা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পেশ করবে। ফাঁকি দিয়ে আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকবে না।

২। দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে ধরনের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবন শুরু করেছিল, জীবন সায়াহ্নে তারা প্রায় সে একই অবস্থায় পৌঁছে যায়। যৌবনের অধিকারী লোকদের এ দৃশ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

৩। আল কুরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। কবিতা চর্চা নবী (সা)-এর জন্য শোভনীয় নয়। এতো একটি উপদেশ, পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব এবং জীবন বিধান, যা জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে। আর কৃতকর্মের অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে।

**বাস্তবায়ন :** ৬৫ থেকে ৭০ পর্যন্ত এ ছয়টি আয়াতের দারসে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের বিভীষিকাময় দৃশ্যের কিছুটা নমুনা তুলে ধরে মানুষকে হুঁশিয়ার করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ - "নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং সময় থাকতেই যেন আমরা আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করার চেষ্টায় তৎপর হই, এ তাওফীক মহান আল্লাহ্ আমাদের দান করুন, আমীন।

**দারস : ৫**

# পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের পরিণাম

## ৮২. সূরা ইনফিতার

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-১৯, রুকূ-১**

**আলোচ্য আয়াত : ১৩-১৯**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٣) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ. (١٤) وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ. (١٥) يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ. (١٦) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ. (١٧) وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ. (١٨) ثُمَّ مَا اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ. (١٩) يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا. وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১৩) নিঃসন্দেহে নেকলোকেরা পরমানন্দে থাকবে, (১৪) আর পাপীরা অবশ্যই যাবে জাহান্নামে, (১৫) বিচারের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে, (১৬) এবং সেখান থেকে কোনোক্রমেই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না, (১৭) আর তুমি কি জানো সে বিচারের দিনটি কি? (১৮) পুনরায় (বলছি) তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি? (১৯) এটি সে দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না, ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা সে দিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারেই থাকবে।

**শব্দার্থ :** اَلْاَبْرَارُ - পুণ্যবান ব্যক্তিগণ, لَفِىْ - মধ্যে অবশ্যই, نَعِيْمٍ - আনন্দে, নিয়ামতে ভরা, اَلْفُجَّارُ - পাপাচারীগণ, جَحِيْمٍ - একটি

দোযখের নাম, يَصْلَوْنَهَا - তারা সেখানে প্রবেশ করবে, بِغَآئِبِيْنَ - অনুপস্থিত।

**নামকরণ :** এই সূরার প্রথম আয়াতের اِنْفَطَرَتْ। শব্দ হতে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে 'ইনফিতার'। এর অর্থ হলো ফেটে যাওয়া। এ সূরায় আকাশ ফেটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল :** এ সূরা মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর মধ্যে একটি। বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে জানা যায় যে, এ সূরা মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন আরম্ভ হয়নি, ঠিক সে সময় নাযিলকৃত সূরা।

**বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :** এই সূরায় প্রথমে আখিরাতের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরে রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে নিজের চোখে দেখতে চায়, সে যেন সূরায়ে তাকভীর, সূরায়ে ইনফিতার ও সূরায়ে ইনশিকাক পড়ে নেয়।" এখানে কিয়ামতের দিনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম ছয়টি আয়াতে বলা হয়েছে– সূর্য রশ্মিহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা ছিন্নভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে শুরু করবে। প্রিয়তম জিনিসগুলোর প্রতিও লোকদের লক্ষ্য থাকবে না। বন-জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এক স্থানে একত্রিত হয়ে যাবে, সমুদ্র উত্তাল ও উদ্বেলিত হয়ে উঠবে।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে রূহ নতুন করে দেহের মধ্যে স্থান পাবে, আমলনামা খোলা হবে, অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশের সমস্ত আড়াল ও আবডাল দূর করা হবে, বেহেশত ও দোযখ চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে সে কি সম্বল নিয়ে এসেছে– এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

তারপর রিসালাতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কাবাসীদের প্রতি বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের সম্মুখে যা কিছু পেশ করেছেন,

তা কোনো পাগলের প্রলাপ নয়, নয় কোনো শয়তানের প্রতারণা। বরং এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত এক মহান মর্যাদাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত পয়গামবাহকের বর্ণনা, মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য জীবন বিধান, যাতে কোনো ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা নেই।

**ব্যাখ্যা :** (ক) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ- وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই নেকলোকেরা পরম আনন্দে থাকবে এবং দুষ্কর্মকারীগণ থাকবে জাহান্নামে।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, "যারা তাঁর অনুগত, বাধ্যগত এবং যারা অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকে।"

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا- وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا.

"সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন আমি মুত্তাকী লোকদেরকে মেহমানদের মতো রহমানের দরবারে আমরা উপস্থিত করবো। আর পাপী ও অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মতো জাহান্নামের দিকে তেড়ে নিয়ে যাবো।" (সূরা মরিয়াম : ৮৫, ৮৬)

হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন : "তাদেরকে আবরার বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা পিতামাতার অনুগত ছিলো এবং সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো।"

(খ) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ.

"বিচারের দিন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তা থেকে কখনও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।"

পাপাচারীরা হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিয়ে প্রতিদান লাভ করার দিনে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক মুহূর্তের জন্যেও তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে না। তাদের মৃত্যুও হবে না, তারা শান্তিও পাবে না। পিপাসায় তাদেরকে এমন গরম পানি দেয়া হবে যাতে তাদের পেটের

নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত সিদ্ধ হয়ে যায়। পুঁজ ও যাক্কুম গাছের কাঁটাজাতীয় খাদ্য দেয়া হবে।

(গ) يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ. (গ)

"সেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য থাকবে না। ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারেই থাকবে।"

সেদিন কেউ কারো কোনো উপকার করতে পারবে না এবং শাস্তি হতে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতাও কারো থাকবে না। তবে হ্যাঁ সুপারিশের অনুমতি যদি স্বয়ং আল্লাহ কাউকেও প্রদান করেন, তবে সেটা আলাদা কথা।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ـ

"এমন কে আছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"

এখানে এক শ্রেণীর মুশরিকদের চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা মনে করে যে, আল্লাহর প্রিয়পাত্রগণ আল্লাহর নিকট কোনো কিছু দাবী করে তার উপর অটল থেকে তা আদায় করেই ছাড়বে। আল্লাহর নিকট থেকে তারা যে কোনো কার্য উদ্ধার করতে সক্ষম। তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় পাত্রগণও বিনা অনুমতিতে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারবেন না।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর আমি ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ.

"আল্লাহ কি সকল শাসকের বড় শাসক নন?"

যদি তোমরা তাঁকে সকল শাসকের বড় শাসক বলে স্বীকার করে থাকো তাহলে কি তোমরা তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? মন্দ ও ভালকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো যে, ভাল

আর খারাপ কাজ যারা করে তারা সকলেই মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে? ভাল কাজের পুরস্কার আর খারাপ কাজের শাস্তি কি দেয়া হবে না? এটা কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে?

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

"(সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে) আজ কর্তৃত্ব কার? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর, যিনি কাহ্হার।"

পৃথিবীতে তো নমরূদ, কারূন, ফিরাউন ও শাদ্দাদের মতো বহু অহংকারী ভ্রান্তলোক নিজেদের বাদশাহি ও শক্তিমত্তার ডঙ্কা বাজাতো আর বহু সংখ্যক নির্বোধ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "সে বিচার দিনের মালিক" সে দিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, এখন বলো প্রকৃতপক্ষে বাদশাহি কার? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? আর এ আখিরাতের কাজ-কারবার কার হুকুমে চলছে?

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? এ বিষয়টি যদি কোনো ব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে যত বড় বাদশাহ্ হোক না কেন, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার মন মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

**শিক্ষা :** ১। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

২। সমগ্র জীবনের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ নেয়ার সাথে সাথেই যার যার পরিণতি জান্নাত ও জাহান্নামে পৌছে দেয়া হবে।

৩। শেষ বিচারের দিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না।

**বাস্তবায়ন :** মানুষকে একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, জীবনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। সময় শেষ হয়ে গেলে আর বাড়িয়ে দেয়া হয় না, এটা আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়। তাই সময় থাকতেই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে খরচ করো ও আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করো।

## দারস : ৬

# দায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের ভালো কাজে যেমন সওয়াব দ্বিগুন, তেমনি পাপ কাজের শাস্তিও দ্বিগুন

## ৩৩. সূরা আল আহ্যাব

মক্কায় নাযিল : আয়াত-৭৩, রুকূ-৯

আলোচ্য আয়াত : ৩০-৩২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٣٠) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا. (٣١) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا. (٣٢) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুন আযাব দেয়া হবে। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ অতি সহজ। (৩১) আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য এবং সৎ কাজ করবে তাকে আমি দু'বার প্রতিদান দেবো এবং তার জন্য সম্মানজনক রিযিকের

ব্যবস্থা করে রেখেছি। (৩২) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে মিহিস্বরে কথা বলো না, যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে বরং পরিষ্কার, সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে।

**শব্দার্থ :** يٰنِسَاءَ - হে স্ত্রীগণ, يَّأْتِ - আসবে, مِنْكُنَّ - তোমাদের মধ্য হতে, بِفَاحِشَةٍ - অশ্লীল কাজ, مُبَيِّنَةٍ - সুস্পষ্ট, يَقْنُتْ - আনুগত্য করবে, تَعْمَلْ - কাজ করবে, صَالِحًا - নেকী, نُؤْتِهَا - তাকে আমরা দেবো, اَجْرَهَا - তার পুরস্কার, مَرَّتَيْنِ - দু'বার, اَعْتَدْنَا - আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, كَرِيْمًا - সম্মানজনক, لَسْتُنَّ - তোমরা নও, كَاَحَدٍ - মতো, اِنِ - যদি, اتَّقَيْتُنَّ - তোমরা ভয় করো, فَلَا - তবে না, تَخْضَعْنَ - কোমল করো, بِالْقَوْلِ - কথাকে, فَيَطْمَعَ - ফলে লালসা করতে পারে, قَلْبِهٖ - তার অন্তরে, مَرَضٌ - রোগ।

**নামকরণ :** এ সূরার ২০ নং আয়াতের يَحْسَبُوْنَ الاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا "এরা মনে করে যে, আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি।" অংশে উল্লিখিত 'আহযাব' (দল) শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল ও বিষয়বস্তু :** এ সূরায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। (১) পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত আহযাব যুদ্ধ। (২) পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত বনী কুরাইযার যুদ্ধ, (৩) পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী করীম (সা) এর বিবাহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় অর্থাৎ হিজরী পঞ্চম সালে সূরাটি নাযিল হয়।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে ইসলামের মুজাহিদদের যে পরাজয় সূচিত হয়, তার ফলে আরবের মুশরিক, ইহুদী ও মুনাফিকদের সাহস বৃদ্ধি ও

তাদের মনে এ আশা জাগ্রত হয়েছিল যে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শেষ করে দিতে তারা সক্ষম হবে। ওহুদ যুদ্ধের পর প্রথম বছরে সংঘটিত ঘটনাগুলো থেকেই তাদের সাহস বৃদ্ধির প্রমাণ মিলে।

**ওহুদের পর ১ম বছরের ঘটনাসমূহ–**

১। নজদের বনী আসান গোত্র মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নবী করীম (সা) আবু সালামা বাহিনীর দ্বারা তাদের লালসার স্বাদ মিটিয়ে দিলেন।

২। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ নামক গোত্রদ্বয় নবী (সা)-এর নিকট তাদের এলাকায় ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন লোক পাঠানোর জন্য দাবী জানান। দাবী অনুযায়ী ছয়জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। জিদ্দার নিকটবর্তী রাজী নামকস্থানে হুযাইল গোত্রের কয়েকজন কাফিরের দ্বারা চারজনকে শহীদ করা হয়। আর যুবাইর ও যায়েদকে মক্কার কাফিরদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

৩। এ সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে নবী করীম (সা) চল্লিশ বা সত্তর জনের এক ইসলাম প্রচারক দল নজদে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

৪। এ সময় মদীনার ইহুদী বনী নজীর গোত্র অসীম সাহসী হয়ে ক্রমাগত কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

৫। চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাতফানের বনু সালাবা ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। স্বয়ং নবী করীম (সা) অগ্রসর হয়ে তাদের এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেন। এভাবে ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে পরবর্তী সাত আট-মাস পর্যন্ত তার জের চলতে থাকে।

কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-এর দৃঢ় বিশ্বাস এবং সাহাবায়ে কিরামের আত্মত্যাগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থার গতি পরিবর্তন হয়ে যায়।

আরবদের অর্থনৈতিক বয়কটের কারণে মদীনাবাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। চার পাশের সকল মুশরিক কবীলা আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছিল। মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী মুনাফিকরা কোঁচের সাপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সত্যপ্রাণ মুমিন রাসূলে করীম (সা)-এর নেতৃত্বে পর পর এমন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার ফলে আরব দেশে ইসলামের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়নি, পূর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধিও পেয়ে গেল।

(আহযাব যুদ্ধের পূর্ববর্তী যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে তাফহীমুল কুরআন সংগ্রহ করে দেখে নেবেন।)

**আহযাব যুদ্ধ**

মদীনার এ উত্থানমুখী শক্তিকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মদীনা হতে বিতাড়িত বনী নজীর গোত্রের যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আরবে অবস্থান নিয়েছিল, এ আক্রমণের প্রস্তাব ও প্রস্তুতি তারাই চালিয়েছিল। তাদের চেষ্টায় কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্য অসংখ্য গোত্রের লোকদেরকে মদীনার উপর এক সম্মিলিত আক্রমণ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে পরিচালিত হয়। এত বড় শক্তি ইতোপূর্বে কোনোদিনই সম্মিলিত হতে পারেনি। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে লুকানো গর্তের সাপও দেখা দিতে থাকে। এতে মোট বারো হাজার জনশক্তি একত্রিত হয়।

নবী করীম (সা) বেখবর ছিলেন না। তাঁর নিয়োজিত সংবাদদাতাগণ, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ভাইয়েরা, যারা সব গোত্রেই বর্তমান ছিলো– শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সর্বদা অবহিত করেছিল।

মদীনা আক্রমণের পূর্বে ছয় দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্থানে 'খন্দক' (পরিখা) খনন করিয়ে নেন। সালআ পর্বত পশ্চাতে রেখে তিন সহস্র সৈনিক সঙ্গে নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়ান। মদীনার দক্ষিণে বিপুল বাগিচা, পূর্বে লাভার পর্বতমালা, পশ্চিম দক্ষিণ কোণে দুর্গম পবর্তমালা। মদীনার বাইরে পরিখার সম্মুখীন হতে হবে এটা তাদের জানা

ছিলো না। ফলে নিরূপায় হয়ে তাদেরকে শীতের মৌসুমে দীর্ঘ অবরোধ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হতে হলো।

বনী কুরাইযার ইহুদী গোত্রসমূহ মদীনার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতো। এদের সাথে মুসলমানদের মিত্রতার চুক্তি ছিলো। চুক্তির দৃষ্টিতে মদীনা আক্রমণ হলে মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয়ে প্রতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে তারা বাধ্য ছিলো। এ কারণে মুসলমানগণ তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিজেদের পুত্র-পরিজনকে বনী কুরাইযাদের অঞ্চলে রক্ষা কেন্দ্রসমূহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিকে প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। কাফিররা এ দুর্বলতার দিকটি লক্ষ্য করতে পেরেছিল। তাদের পক্ষ হতে বনী নজীরের ইহুদী সরদার হাই ইবনে আখতারকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনী কুরাইযার নিকট পাঠানো হলো। প্রথম বনী কুরাইযা প্রত্যাখ্যান করলো এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল যে, মুহাম্মদ-এর সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হাই ইবনে আখতার যখন তাদেরকে বললো "দেখো আরবের মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করে এনেছি, এখন হচ্ছে এ ব্যক্তিকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তোমরা যদি এ সময়কে মূল্য না দাও, তবে আর কখনও এমন সুযোগ পাবে না।" তখন ইহুদী মানসিকতা ইসলামের দুশমনি করতে প্রস্তুত হলো।

নবী করীম (সা) আনসারদের কয়েকজনকে পাঠিয়ে সঠিক সময়ে তাদের চুক্তি ভঙ্গের খবর নিলেন। এ কঠিন মুহূর্তে নবী করীম (সা) বনী গাফতানের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করতে চাইলেন। কিন্তু সা'আদ ইবনে উবাদাহ, সা'আদ ইবনে মুয়াজ প্রমুখ আনসার সরদারগণের সঙ্গে নবী করীম (সা) যখন এ শর্ত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন, তখন তারা বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ করা কি আপনার ইচ্ছা, না আল্লাহর হুকুম? আল্লাহর হুকুম হলে তা আমরা মেনে নিতে বাধ্য। নাকি আমাদের

রক্ষার্থে আপনি এ প্রস্তাব করছেন?" উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন, "আমি কেবল আমাদের হেফাযতের উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছি।" এ কথা শুনে উভয় সরদারই একবাক্যে বললেন, "আপনি যদি আমাদের খাতিরে এ চুক্তি করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তবে আপনি তা খতম করুন, আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখনও এসব গোত্র আমাদের নিকট হতে একটা দানাও খাজনা বাবদ আদায় করতে পারেনি। আর এখন তো আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এখন কি এরা আমাদের খাজনা নিতে পারবে? এখন তাদের ও আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র তরবারিই সিদ্ধান্তকারী হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোনো ফায়সালা করে না দেন।" এ কথা বলে তারা স্বাক্ষরবিহীন চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলেন।

এ সময়ই গাফতান গোত্রের শাখা আশজা গোত্রের নঈম ইবনে মাসঊদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমার ইসলাম কবুল করার কথা এখনো কেউ জানতে পারেনি, এখন আপনি আমার দ্বারা যে কাজই করাতে চান, আমি তা সম্পন্ন করতে পারি। নবী করীম (সা) বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে শত্রুদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার কোনো উপায় উদ্ভাবন করো।"

এ নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রথমে বনী কুরাইযার নিকট উপস্থিত হলেন। এদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব হতেই যথেষ্ট মেলামেশা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো। তিনি তাদেরকে বললেন যে, কুরাইশ ও গাতফান কবিলার লোক অবরোধের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চাদাপসারণ করতে পারে, তাতে তাদের কোনো হ্রাস বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু তোমাদেরতো মুসলমানদের সাথে এখানেই থাকতে হবে। তারা চলে গেলে তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না এ বহিরাগত কবিলাসমূহের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধকস্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবে। বনী কুরাইযার লোকদের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে বসলো এবং তারা মিলিত ফ্রন্টের নিকট বন্ধক দাবী করার সিদ্ধান্ত নিলো। তারপর নঈম ইবনে মাসঊদ কুরাইশ গাতফান সরদারদের নিকট উপস্থিত

হলেন এবং বললেন যে, বনী কুরাইযার লোকেরা কিছুটি দুর্বলতা দেখাতে শুরু করেছে মনে হয়। তারা হয়তো তোমাদের নিকট বন্ধকস্বরূপ কয়েক ব্যক্তির দাবী পেশ করবে এবং তাদেরকে মুহাম্মদের নিকট আটক রেখে তার সাথে সন্ধি করে নেবে এবং এ অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই তাদের সাথে খুব সতর্কতার সাথে কথা বলতে হবে।

ফলে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বনী কুরাইযা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযা সরদারদের নিকট সংবাদ পাঠালো যে, এ দীর্ঘ অবরোধ ব্যবস্থায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এখন এক চূড়ান্ত যুদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক। আগামীকাল তোমরা ঐদিক থেকে আর আমরা এদিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ চালাবো। বনী কুরাইযা এর জবাবে বলে উঠলো যে, তোমাদের মধ্য হতে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকস্বরূপ না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধের ঝুঁকি কাঁধে নিতে পারি না। একথা শুনে যুক্তফ্রন্টের কয়েকজনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, নঈমের কথা সত্য। তারা বন্ধক দিতে অস্বীকার করলো। এর দরুন বনী কুরাইযার লোকেরা বুঝতে পারলো যে, নঈম আমাদের ভাল পরামর্শই দিয়েছেন। ফলে এ সামরিক চাল সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলো এবং দুশমনদের শিবিরে ভাঙ্গন সৃষ্টি হলো।

এভাবে অবরোধ ২৫ দিন হতেও দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে গেল। একে তো শীতকাল, এত বড় সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য, পানি, জন্তু-জানোয়ারের রসদ সংগ্রহ করা কঠিনতর হয়ে উঠল। পরস্পরের মধ্যে ভাঙ্গন ধরার দরুন অবরোধকারীদের সাহস উদ্যমেও ভাটা পড়তে লাগলো। এ অবস্থায় সহসা একরাত্রে প্রচণ্ড ঝড় আসলো; এতে শীতের প্রকোপ, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রের গর্জন ছিলো। চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেললো যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। ঝড়ের তাণ্ডবে শত্রুবাহিনীর তাঁবু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো, তাদের মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি হলো। তারা আল্লাহর কুদরতের এ কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারলো না। রাতের মধ্যেই পলায়নপর হয়ে যার যার ঘরের দিকে চলে গেলো। সকাল বেলা মুসলমানগণ জাগ্রত হয়ে দেখে

ময়দানে একজন শত্রুসৈন্যও নেই। নবী করীম (সা) এ দেখে বলে উঠলেন, "অতঃপর কুরাইশের লোকেরা কখনো তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না, বরং তোমরাই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে।"

## বনী কুরাইযার অবসান

খন্দক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর যুহরের সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে হুকুম করলেন ঃ "এখনি হাতিয়ার পরিত্যাগ করা ঠিক নয়, বনী কুরাইযার ব্যাপারটি এখনো বাকী রয়ে গেলো, তাদের ব্যাপারটিও এখনই চুকিয়ে নেয়া আবশ্যক।" এ নির্দেশ পেয়েই নবী করীম (সা) বিলম্ব না করে ঘোষণা দিলেন ঃ "যারাই অনুগতশীল আছ তারা যেন বনী কুরাইযার অঞ্চলে না পৌঁছে আসরের নামায না পড়ে।" এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে এক বাহিনীসহকারে বনী কুরাইযার অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তারা সেখানে পৌঁছলে ইহুদীরা ঘরের ছাদে উঠে নবী করীম (সা) এবং মুসলমানদের উপর গালাগালের বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু তারা যে মূল লড়াইয়ের সময় চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলিত হয়ে মদীনার সমগ্র জনতাকে কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল, এ মারাত্মক অপরাধের শাস্তি হতে তারা কিভাবে রক্ষা পেতে পারে। হযরত আলী (রা)-র বাহিনী দেখে তারা মনে করছিল যে, তাদেরকে শুধু ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একটু পরেই যখন রাসূল করীম (সা)-এর নেতৃত্বে সমগ্র ইসলামী বাহিনী সেথায় উপনীত হলো এবং গোটা এলাকাকে পরিবেষ্টন করে নিল তখন তাদের প্রাণ উড়ে গেলো। অবরোধের তীব্রতা দু-তিন সপ্তাহের অধিককাল সহ্য করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তে তারা নিজেদেরকে রাসূলে করীম (সা)-এর হাতে সমর্পণ করলো ঃ "আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায (রা) তাদের সম্পর্কে যে ফায়সালাই করে দিবেন, তা উভয়পক্ষ মেনে নেবে।"

হযরত সা'আদকে তারা সালিশ মেনেছিল এ আশায় যে, জাহিলিয়াতের যুগে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী

হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই সে কথা মনে রাখবেন এবং সেদিকে খেয়াল রেখেই ফায়সালা দিবেন। ইতোপূর্বে বনী কাইনুকা ও বনী নজীর গোত্রদ্বয়কে যেভাবে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, অনুরূপভাবে তাদেরকেও যেতে দেয়া হবে। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'আদের (রা) নিকট মিত্র গোত্রের প্রতি উদার নীতি অবলম্বনের দাবী জানাচ্ছিল, কিন্তু হযরত সা'আদ (রা) একটু পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, মদীনা হতে যে দু'টো গোত্রকে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, তারা কিভাবে চতুর্দিকের সমগ্র গোত্র কবিলাকে উত্তেজিত করে দশ বার হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল। উপরন্তু এ শেষ পর্যায়ের ইহুদী কবিলা বহিরাক্রমণের কঠিন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল, হযরত সা'আদ তাও ভুলতে পারেননি। এসব কারণেই তিনি ফায়সালা করে দিলেন যে, বনী কুরাইযার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে দাস করে নেয়া হবে। আর তাদের যাবতীয় ধন সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। এ ফায়সালাকে কার্যকর করা হলো। মুসলমানগণ যখন মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন, তখন জানা গেলো যে, বিগত পরিখা যুদ্ধে মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য এ বিশ্বাসঘাতকরা ১৫শ তরবারি, তিনশ বর্শা, দুই হাজার বল্লম এবং ১৫শ ঢাল সংগ্রহ করে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যদি সহায়তা না করতেন তবে তো এ সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হতো। এ কথা জানার পর হযরত সা'আদের ফায়সালার যথার্থতায় এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

(সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলী, যয়নব (রা)-এর বিবাহ সম্পর্কে অপপ্রচারের প্লাবন, পর্দার প্রাথমিক বিধান ও রাসূলে করীম (সা)-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লিখলে কলেবর বৃদ্ধি পায়। তাই যাদের বিশেষ প্রয়োজন তারা তাফহীমুল কুরআন দেখে নিবেন।)

**ব্যাখ্যা :** (৩০) يٰنِسَاءَ النَّبِىِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا.

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ অর্থাৎ মুমিনদের মাতারা যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা) ও আখিরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন, তখন মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাঁদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের কাজ কারবার সাধারণ নারীদের মতো নয়। তোমাদের দ্বারা যদি নবী করীম (সা)-এর অবাধ্যতা কিম্বা নির্লজ্জতাপূর্ণ কোনো কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে জেনে রেখো যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের শাস্তি দ্বিগুন হবে। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমরা সাধারণ নারীদের হতে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং পাপকার্য হতে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। তাই তোমাদের নৈতিক চালচলন হতে হবে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ - "যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে।" (আয্ যুমার ঃ ৬৫) এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) থেকে কোনো শিরকের আশঙ্কা ছিলো। বরং নবী করীম (সা)-কে এবং তাঁর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শিরক কত ভয়াবহ অপরাধ এবং তাকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা অপরিহার্য, সে কথা বুঝানোই ছিলো উদ্দেশ্য।

তোমরা এমন ভুলের মধ্যে অবস্থান করো না যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে অথবা তোমাদের মর্যাদা এত বেশী উন্নত যে, সে কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও করা আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ (৩১)
اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا.

"আর তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎ কাজ করবে, তাকে আমি দু'বার প্রতিদান দেবো। আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

নেকির জন্য দু'বার পুরস্কার ও গোনাহর জন্য দু'বার শাস্তি দেবার কারণ হচ্ছে এ যে, আল্লাহ্ যাদেরকে মানুষের সমাজে কোনো উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তারা সাধারণত জনগণের নেতা হয়ে যায় এবং জনগণের বিরাট অংশ ভাল ও মন্দ কাজে তাঁদেরকেই অনুসরণ করে চলে। তাঁদের খারাপ কাজ শুধুমাত্র তাঁদের একার খারাপ কাজ হয় না। বরং একটি জাতির চরিত্র বিকৃতির কারণও হয় এবং তাদের ভালো কাজ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো কাজ হয় না বরং বহু লোকের কল্যাণ সাধনেরও কারণ হয়। তাই তারা যখন খারাপ কাজ করে তখন নিজেদের খারাপের সাথে সাথে অন্যদের খারাপেরও শাস্তি পায় এবং যখনই তারা সৎ কাজ করে তখন নিজেদের সৎকাজের সাথে সাথে অন্যদেরকেও তারা যেসৎ পথ দেখিয়েছে তারও প্রতিদান লাভ করে।

আলোচ্য আয়াত থেকে এ মূলনীতিও স্থিরীকৃত হয় যে, যেখানে মর্যাদা যতবেশী সেখানে মর্যাদাহানী ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ ততবেশী কঠোর হবে এবং এর সাথে তার শাস্তিও হবে ততবেশী কঠিন। যেমন মসজিদে শরাব পান করা নিজ গৃহে শরাব পান করার চেয়ে বেশী ভয়াবহ অপরাধ এবং এর শাস্তিও কঠোর। মুহরিম নারীদের সাথে যিনা করা অন্য নারীদের সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী গুনাহ্ এবং এজন্য শাস্তিও হবে বেশী কঠিন।

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ (৩২) تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا.

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহিস্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।"

এখান থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পর্দা সংক্রান্ত বিধানের সূচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের মাধ্যমে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ সংশোধনীগুলো প্রবর্তন

করা হয়েছে। নবী করীম (সা)-এর গৃহটিই সকল মুসলিম পরিবারের আদর্শ। এ আয়াতগুলোতে নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাই কেউ কেউ দাবী করেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র নবী পরিবারের সাথেই সংশ্লিষ্ট। সামনের দিকের আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন, এর মধ্যে কোনোটি এমন যা শুধু নবীর পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকী মুসলিম নারীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়। কেবলমাত্র নবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ জীবন যাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরাই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই? যদি এ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহিলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং ভিন্ন পুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্য সব মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে কিছুবিধিকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট বলার ন্যায়সঙ্গত কোনো যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও"– এ বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া এবং ভিন্ন পুরুষের সাথে খুব ঢলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত। উদাহরণস্বরূপ– এক ভদ্রলোক নিজের সন্তানদেরকে বলে, "তোমরা বাজারের ছেলে-মেয়েদের মতো নও। তোমাদের গালাগালি না করা উচিত।" এ থেকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে না যে, সে কেবলমাত্র নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্য গাল দেয়াকে খারাপ মনে করে, অন্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে তার কোনো আপত্তি নেই।

প্রয়োজনে পর পুরুষের সাথে কথা বলতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু এ সময় নারীর কথা বলার ভঙ্গি এমন হতে হবে যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কখনও এ ধরনের কোনো চিন্তার উদয় হয় না যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে। তার বলার ভঙ্গিতে কোনো নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোনো মন মাতানো ভাব থাকবে না। সে সজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে

তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোনো নারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহভীতি ও অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে। এটা দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া নারীদের কথা বলার ভঙ্গিমা, মুমিন ও মুত্তাকী নারীদের নয়। এ প্রসঙ্গে সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটিও উল্লেখ করা দরকার– وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ("তারা যেন যমীনের উপর এমনভাবে পদাঘাত করে না চলে যার ফলে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছিল তা লোকদের চোখে পড়ে।") এ থেকে মনে হয় সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অলংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষকে না শোনায় এবং প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে। এ জন্য নারীদের আযান-ইকামত নেই। তাছাড়া জামাআতের নামাযে নারী উপস্থিত থাকলে ইমাম সাহেব ভুল করলে নারীগণ পুরুষের মতো লুকমা দিতে পারবে না, তারা কেবলমাত্র হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান।

এখন বিবেচনার বিষয় হচ্ছে যে, শরীয়ত নারীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে কোমলস্বরে কথা বলতে অনুমতি দেয় না এবং পরপুরুষের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতে অনুমতি দেয় না, সে কি কখনও নারীর মঞ্চে এসে নাচ, গান, বাজনা ও রঙ্গরস করতে পারে? রেডিও, টেলিভিশনে নারীদের প্রেমের গান, সুমিষ্ট স্বরে অশ্লীল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি পেতে পারে? নারীরা নাটকে কখনো কারো স্ত্রী, কারো প্রেমিকার অভিনয় করতে পারে? তাদেরকে বিমানবালা করা হবে, যাত্রীদের মন ভুলাবার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কিম্বা ক্লাবে, সামাজিক উৎসবে ও নারী পুরুষের অনুষ্ঠানে তারা চমকপ্রদ সাজসজ্জা করে আসবে এবং পুরুষদের সাথে অবাধে মিলে-মিশে কথাবার্তা ও ঠাট্টা তামাশা করবে, এসবকে কি সে বৈধ বলবে? এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন্ কুরআন থেকে? আল্লাহর নাযিল করা কুরআন তো সবার সামনে আছে। সেখানে

কোথাও যদি এ সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে সে জায়গাটি চিহ্নিত করা হোক।

**শিক্ষা :** ১। নবী করীম (সা) ও তাঁর পরিবারের বিভিন্ন দিকের কাজ কর্ম আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। তাই নবী পরিবারকে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সংশোধন করতে চান।

২। নেকির জন্য দ্বিগুন পুরস্কার আর গুনাহর জন্য দ্বিগুন শাস্তি দেবার কারণ হচ্ছে এ যে, যেখানে মর্যাদা যতবেশী এবং যতবেশী বিশ্বস্ততার আশা করা হবে, সেখানে মর্যাদাহানী ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ ততবেশী কঠোর এবং এর সাথে তার শাস্তিও হবে ততবেশী কঠিন।

৩। যে ইসলামী শরীয়ত নারীকে পর পুরুষের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতে অনুমতি দেয় না ও প্রয়োজনে কোমল স্বরে কথা বলতে নিষেধ করে, সে শরীয়ত কখনও নারীর মঞ্চে এসে নাচ, গান, বাজনা ও রঙ্গরস করা রেডিও-টেলিভিশনে প্রেমের গান, সুমিষ্ট স্বরে অশ্লীল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি দেয় না।

**বাস্তবায়ন :** সূরায়ে আহ্যাবের ৩০, ৩১ ও ৩২ নং আয়াতের দারসের শিক্ষার আলোকে আমাদের বিশেষ করে আমাদের নারী সমাজের নবী করীম (সা)-এর পারিবারিক জীবনের অনুসরণে চলার তাওফীক কামনা করছি। আমীন॥

## দারস : ৭

# জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব

## ৬২. সূরা জুমু'আ

মদীনায় নাযিল : আয়াত-১১, রুকূ-২

আলোচ্য আয়াত : ৯, ১০ ও ১১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (١٠) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (١١) وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৯) "ওহে যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হয়, তখন আল্লাহর স্মরনের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমরা জানো। (১০) অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান করো। আর আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে। (১১) আর যখন তারা লাভজনক কোনো বেচাকেনা বা

খেল-তামাশা হতে দেখলো, তখন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেলো এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেলো। তাদেরকে বলো : আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা খেল তামাশা ও ব্যবসার অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা।"

**শব্দার্থ :** نُوْدِىَ - ডাকা হয়, لِلصَّلٰوةِ - নামাযের জন্য, يَوْمِ - দিনে, الْجُمُعَةِ - জুমু'আর, فَاسْعَوْا - তখন তোমরা ধাবিত হও, ذِكْرِ - স্মরণ, ذَرُوْا - ত্যাগ করো, الْبَيْعَ - বেচা-কেনা, ذٰلِكُمْ - এটা, خَيْرٌ - উত্তম, لَكُمْ - তোমাদের জন্য, اِنْ - যদি, كُنْتُمْ - তোমরা, تَعْلَمُوْنَ - জানতে, فَاِذَا - অতঃপর যখন, قُضِيَتِ - সমাপ্ত হয়, فَانْتَشِرُوْا - তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়ো, فِى الْاَرْضِ - যমীনের উপর, اِبْتَغُوْا - তোমরা সন্ধান করো, فَضْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর অনুগ্রহ। اُذْكُرُوْا - তোমরা স্মরণ করো, كَثِيْرًا - অধিক, لَعَلَّكُمْ - সম্ভবত তোমরা, تُفْلِحُوْنَ - তোমরা সফল হবে, رَاَوْا - তোমরা দেখলে, تِجَارَةً - ব্যবসা, لَهْوًا - খেল-তামাশা, اِنْفَضُّوْا - তারা ছুটে গেলো। تَرَكُوْكَ - তোমাকে ছেড়ে গেলো, قَائِمًا - দাঁড়ানো অবস্থায়।

**নামকরণ :** নবম আয়াতের অংশ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ - হতে এ সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে সূরায়ে জুমু'আ। এ সূরায় জুমু'আর নামাযের বিধানও উল্লিখিত হয়েছে। জুমু'আ এ সূরার সামষ্টিক শিরোনাম নয়। অন্যান্য সূরার মতো এখানেও একটি চিহ্ন হিসেবে এ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

**নাযিলের সময় :** সূরার ১ম রুকূর আয়াতসমূহ ৭ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। সম্ভবত তা খায়বার বিজয়কালে অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদীস গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম, ঠিক সে সময়েই এ আয়াত নাযিল হয়। আর ইতিহাস হতে প্রমাণ পাওয়া

যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ও খায়বার বিজয়ের পূর্বে আবু হুরায়রা (রা) ঈমান এনেছিলেন। অতএব অনুমান করা যায় যে, ইহুদীদের প্রাণকেন্দ্র খায়বার বিজয়ের পরই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক এ আয়াতসমূহ নাযিল করে থাকবেন। সে সময় খায়বারের পরিণতি দেখে উত্তর মদীনার ইহুদী বসতিগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়েছিল।

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূর আয়াতসমূহ হিজরতের পর পরই জুমু'আর নামায কায়েমের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়। হিজরতের পঞ্চম দিনেই জুমু'আর নামায কায়েম হয়। এ রুকূর শেষ আয়াতটি এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন জুমু'আর নামায কায়েম হওয়ার পর লোকেরা দীনি সভা-সম্মেলনের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা তখনও পুরা মাত্রায় শিক্ষা লাভ করতে পারেনি।

**আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য :** দু'টো রুকূ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে, এদের আলোচ্য বিষয়ও এক নয়। কিন্তু দু'টো রুকূর মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই রুকূদ্বয়কে একই সূরায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উভয় রুকূর আলোচ্য বিষয় পৃথকভাবেই বুঝবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

ইসলামের অগ্রগতি রোধ করার জন্য ইহুদীদের বিগত ছ'বছরের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। রাসূলে করীম (সা)-কে দুর্বল করার জন্য মদীনার প্রথম যে তিনটি শক্তিশালী গোত্র চেষ্টা চালায়, তাদের একটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আর বাকী দু'টো গোত্র নির্বাসিত হতে হয়। পরে তারা ষড়যন্ত্র ও যোগ সাজশ করে আরবের বহু কয়টি গোত্রকে মদীনার উপর চড়াও করে। আহযাব যুদ্ধে সকলেই আঘাত খেলো। তাদের শেষ সম্বল সর্বাপেক্ষা বড় লীলা কেন্দ্র খায়বার যখন মুসলমানদের আয়ত্তে এসে যায় তখন ইহুদীরা আবেদন-নিবেদন করে মুসলমানদের জমি চাষকারী হিসেবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। এ শেষ পরাজয়ের পর আরবে ইহুদী শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তাইমা' তাবুক সবই এক এক করে অস্ত্র সংবরণ করলো। আরবের

ইহুদীগণ ইসলামের অস্তিত্ব সহ্য করা তো দূরের কথা, এর নাম শুনতেও তারা প্রস্তুত ছিলো না। আর এ সময়েই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতগুলোতে ইহুদীদের সম্বোধন করে শেষ বারের মতো কথা বলেন।

(ক) রাসূল করীম (সা)-কে তোমরা মেনে নিতে অস্বীকার করছো এই কারণে যে, তিনি উম্মী জাতের মধ্যে এসেছিলেন। যাকে তোমরা ঘৃণা করতে, তোমাদের সিদ্ধান্ত এ ছিলো যে, রাসূল অবশ্যই তোমাদের জাতের মধ্যেই হতে হবে, এর বাইরে কেউ রাসূল দাবী করলে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মী জাতের মধ্যেই একজন রাসূল পাঠালেন। তিনি তোমাদের চোখের সামনেই আল্লাহ্র কালাম শুনাচ্ছেন, লোকদের আত্মা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি করান এবং গুমরাহি থেকে হেদায়াতের পথ দেখান। মূলত এ কাজ আল্লাহ্র অনুগ্রহের ব্যাপার। তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন। তাঁর অনুগ্রহ দানের উপর কারোও কোনো একচেটিয়া কর্তৃত্ব নেই।

(খ) তোমাদেরকে তাওরাত কিতাবের বাহক বানানো হয়েছিল; কিন্তু তোমরা তার কোনো দায়িত্বই পালন করোনি। গাধারা জানে না যে কোন্ জিনিসের বোঝা তারা বহন করছে? তোমরাও জান না যে কোন্ জিনিসের বাহন তোমাদেরকে বানানো হয়েছে? গাধার তো জ্ঞান বুদ্ধি নেই, তোমাদের তো তা আছে। তাই গাধা অপেক্ষা তোমরা নিকৃষ্ট। তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলতে ও অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হও না। তোমরা নিজদেরকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র ও রিসালাতের নিয়ামত চিরদিনের জন্য কেবল তোমাদের নামেই লিখে দেয়া হয়েছে– বলে মনে করছো। সম্ভবত তোমাদের ধারণা এ যে, তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের হক আদায় করো আর না করো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকেই তাঁর কিতাবের ধারক ও বাহক বানাতে একান্তভাবে বাধ্য।

(গ) মৃত্যুর ভয় এতটা তীব্র কেন তোমাদের? তোমরা যদি আল্লাহ্র আদুরে ও প্রিয়পাত্র হতে এবং আল্লাহ্র নিকট তোমাদের জন্যে বড় মানসম্মান ও

মর্যাদা সুরক্ষিত আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতো, তাহলে তোমাদের মনে মৃত্যুর ভয় এতটা তীব্র হতো না। মৃত্যুর ভয়ই তোমাদেরকে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছে। তোমাদের এ অবস্থা প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছো। এসব কার্যকলাপ নিয়ে মারা গেলে দুনিয়া অপেক্ষা আখিরাতে অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে তোমাদের মন খুব সজাগ ও নিঃসন্দেহ।

উপরে উল্লেখিত কথাগুলো হলো ১ম রুকূর বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় রুকূর আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল কয়েক বছর পূর্বে। তবে এ সূরায় শামিল করার একমাত্র কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের সাব্‌ত বা শনিবারের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে জুমু'আ দান করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সাবধান করে দিতে চান যে, ইহুদীগণ সাব্‌তের সাথে যে আচরণ করেছে, মুসলিমগণ যেন জুমু'আর সাথে তেমন আচরণ না করে।

একদিন জুমু'আর নামাযের সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা আসলে তাদের ঢোল ও বাদ্যের শব্দ শুনে বারজন লোক ব্যতীত আর সবাই মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে দৌড়ে কাফেলার নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। অথচ তখন মসজিদে খুতবা চলছিল। তাই এখানে নির্দেশ দেয়া হয় যে, জুমু'আর আযান হওয়ার পর সব রকম কেনা-বেচা ও অন্য সকল প্রকার কর্ম ব্যস্ততা হারাম। এ সময় ঈমানদারদের কাজ হলো আল্লাহর ইবাদতে মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া। নামায শেষ করার পর নিজেদের জীবিকার সন্ধানে অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

"হে মুমিনেরা! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হবে, তখন বেচা-কেনা বন্ধ করে আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও।"

হিজরতের পূর্বে মক্কী জিন্দেগীর শেষ ভাগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর জুমু'আ ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়। কিন্তু সে সময় মক্কায় সামষ্টিক কোনো ইবাদত করা সম্ভব ছিলো না। তাই নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে প্রথম দিকের হিজরতকারীদের দায়িত্বশীল ১২ জন লোক নিয়ে মদীনায় সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায আদায় করেন। খুতবা থাকার কারণে জুমু'আর নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। হযরত উসমান (রা)-এর আমলে জনবসতি বেড়ে গেলে তিনি আরও একটি আযান দেয়া শুরু করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন মসজিদে দৈনিক পাঁচবার আযান দিয়ে নামাযের জন্য ডাকা হয়, সে আযানের ভাষা কুরআনের কোথাও নেই। এ প্রথাটি রাসূল (সা) কর্তৃক নির্ধারিত। এ প্রথাটিকে আল-কুরআনের দু'টি স্থানে সমর্থন করা হয়েছে। প্রথমতঃ এ আয়াতে, দ্বিতীয়তঃ সূরায়ে মায়েদার ৫৮ নং আয়াতে।

আযানের মতো জুমু'আর নামাযটিও রাসূল (সা) কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআনে এ আয়াতটি জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব ও বিশেষভাবে পালন করার জন্যই নাযিল হয়েছে। জাহিলী যুগে আরবে এ দিনটিকে ইয়াওমে আরূবা বলতো। ইসলামী যুগে শুক্রবারকে মুসলিমদের সমাবেশের দিন হিসেবে নাম দেয়া হয় 'জুমু'আ'।

জুমু'আর নামাযের ঘোষণা শুনেও তারা নামাযের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে গাফলতি করতো এবং বেচা-কেনার কাজেই ব্যস্ত থাকতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করে জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব ও ফরয আদায়ের জন্য মানুষকে সাবধান করে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

(খ) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

"নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান করো।"

জুমু'আর নামাযের পর যমীনে ছড়িয়ে পড়া এবং রিযিকের সন্ধানে ব্যস্ত হওয়া জরুরি অর্থে বলা হয়নি বরং অনুমতি দেয়ার অর্থে বলা হয়েছে। জুমু'আর আযান শুনে বিলম্ব না করে সমস্ত কাজ কারবার এমনকি

বেচা-কেনা পর্যন্ত বন্ধ করে দ্রুত নামাযে হাযির হও। নামায শেষে আবার তোমরা তোমাদের ফেলে আসা অসমাপ্ত কাজে বা যে কোনো কাজে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া গেলো। তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং নিজেদের যে কোনো কাজ করতে চাও তো করো। ইহ্‌রাম ভাঙ্গার পর শিকারের অনুমতির সঙ্গে এ কথার তুলনা করা হয়েছে। এ আয়াত অনুযায়ী যারা বলে কুরআন অনুযায়ী ইসলামে জুমু'আর ছুটি নেই, তারা ভুল কথা বলে। সপ্তাহে যদি একদিন ছুটি পালন করতে হয়, তবে তা শুক্রবার করা উচিত। যেমন খৃস্টানেরা রবিবারে এবং ইহুদীরা শনিবারে সাপ্তাহিক ছুটির দিন পালন করে থাকে।

(গ) وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِ انْفَضُّوْآ اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"আর তারা যখন ব্যবসা বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে, সেদিকে দৌড়ে গেলো। তাদেরকে বলো আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।"

এটি মুসলমানদের মাদানী জিন্দেগীর প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা ঠিক জুমু'আর নামাযের সময় মদীনা নগরীতে এসে পৌছলো। জনবসতির লোকদের নিকট তাদের আগমন সংবাদ পৌছার জন্য তারা ঢোল-বাদ্য বাজাতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) সে সময় খুতবা দিচ্ছিলেন। বাদ্য যন্ত্রের শব্দ শুনে ১২ জন ব্যতীত আর সব লোক অস্থির হয়ে বাকী নামক স্থানে ছুটে গেলো। উপস্থিত বার জন লোককে নবী করীম (সা) বললেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ اَحَدٌ لَسَاَلَ بِكُمُ الْوَادِىْ نَارًا.

"তোমরা সবাই যদি চলে যেতে এবং একজনও উপস্থিত না থাকতে তবে এ উপত্যকা আগুনের প্রবাহে ঘিরে ফেলতো।"

হিজরতের পর পরই সাহাবীদের প্রশিক্ষণ ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ে। আর মদীনা ছিলো কাফিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য, জিনিসপত্রের দাম ছিলো আকাশ ছোঁয়া, খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছিল। এমন একটি পরিস্থিতিতে বাণিজ্য কাফেলার জিনিসপত্র বিক্রি শেষ হয়ে যায় এই ভয়ে তারা সেদিকে ছুটে গিয়েছিল। এটা ছিলো এমন একটা দুর্বলতা, যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং কঠোর পরিস্থিতির কারণে ঘটেছিল। পরবর্তীকালে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবীগণের দ্বারা দুনিয়া, আখিরাত অপেক্ষা অধিক মূল্যায়িত হয়নি।

**শিক্ষা :** ১। শুক্রবারে জুমু'আর নামাযের ঘোষণা আসলে বেচা-কেনা বন্ধ করে আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া অতীব জরুরি।

২। জুমু'আর নামায শেষ হয়ে গেলে আবার আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমীনে ছড়িয়ে পড়লে সাফল্য লাভ করা যাবে।

৩। আল্লাহর নিকট জুমু'আর দিনের মর্যাদা, খেল-তামাশা ও ব্যবসা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

**বাস্তবায়ন :** জুমু'আর দিনকে সাইয়েদুল আইয়্যাম বা দিনের সরদার বলা হয়। এ দিনে ধনী দরিদ্র সমষ্টিগতভাবে এক সারিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ায় তাদের মধ্যে একতা, শৃঙ্খলা, সত্যবাদিতা, অহিংসা ইত্যাদি গুণের সৃষ্টি হয়। সমাজের মধ্যে যারা নামায পড়ে না আমরা তাদেরকে হেকমতের সাহায্যে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে নামাযে হাযির করতে চেষ্টা করবো। ইমাম সাহেবের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান করতে সচেষ্ট হবো, ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

# দারস : ৮

## আল্লাহভীতি সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক

### ৫. সূরা আল মায়েদা

মদীনায় নাযিল : আয়াত-১২০, রুকূ-১৬

আলোচ্য আয়াত : ৮, ৯ ও ১০।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. (٩) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ. (١٠) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৮) "হে ঈমানদারগণ! সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। কোনো দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এমন উত্তেজিত না করে তোলে যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে দূরে সরে পড়ো। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটা আল্লাহভীতির সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যে সকল কাজ করো আল্লাহ তা পুরোপুরি অবগত আছেন। (৯) ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা আছে যে, তাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে। (১০) আর যারা কুফরি করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।"

**শব্দার্থ :** كُوْنُوْا - তোমরা থাকো, قَوَّمِيْنَ - প্রতিষ্ঠিত, شُهَدَاءَ - সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, بِالْقِسْطِ - ন্যায়ের উপর, يَجْرِمَنَّكُمْ - তোমাদেরকে প্ররোচিত করে, شَنَاٰنُ - বিদ্বেষ, قَوْمٍ - কোনো জাতির, اَلاَّ - এই যে, تَعْدِلُوْا - তোমরা ইনসাফ করো, اَقْرَبُ - নিকটতর, لِلتَّقْوٰى - দৃঢ় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, وَاتَّقُوا اللّٰهَ - এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, خَبِيْرٌ - খুবই অবগত, بِمَا - এ বিষয়ে, تَعْمَلُوْنَ - তোমরা আমল করো, الصّٰلِحٰتِ - নেকীর, مَغْفِرَةٌ - ক্ষমা, اَجْرٌ - প্রতিফল, عَظِيْمٌ - বিরাট, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا - এবং যারা কুফরি করে, وَكَذَّبُوْا - মিথ্যা মনে করে, بِاٰيٰتِنَا - আমাদের আয়াতগুলোকে, اُولٰٓئِكَ - ঐসব লোক, اَصْحٰبُ - অধিবাসী, الْجَحِيْمِ - দোযখের।

**নামকরণ :** এ সূরার পঞ্চদশ রুকূর مَائِدَةً শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। مَائِدَةً - অর্থ খাদ্য ভরা পাত্র। অন্যান্য সূরার মতো এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামের কোনো সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ এ নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময় :** এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে সমর্থন পাওয়া যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীর শেষ অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে এ সূরা নাযিল হয়। ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে নবী করিম (সা) চৌদ্দশত সাহাবী ও কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে ওমরা করার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। পথিমধ্যে কুরাইশ কাফিরগণ বাধা প্রদান করে। অনেক বাদানুবাদের পর আগামী বছর ওমরা করার অনুমতি দেয়া হয়। এতে মুসলমানদের কিছুটা সুবিধাও হয়। প্রথমতঃ পরবর্তী বছর ইসলামী নীতি অনুযায়ী ওমরা করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ কাফিরদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়েছিল যে, কাফিরগণ যেভাবে মুসলিমদের ওমরার পথে বাধা প্রদান করেছিল, অসংখ্য কাফির গোত্রের বাণিজ্য যাত্রার পথ মুসলিম অধিকৃত এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে তারাও অনুরূপভাবে কাফিরদের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো।

বিষয়বস্তুর বর্ণনাধারা অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে, এ সূরাটি এক সাথে একই সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। অবশ্য এর কোনো কোনো আয়াত অন্যান্য সময় নাযিল হলেও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার বিভিন্ন স্থানে স্থান করে দেয়া হয়েছে। যদি তা হয়েও থাকে তবে সূরা বর্ণনার ক্রমিক ধারা বা সামঞ্জস্যহীনতার বিন্দুমাত্র শূন্যতা অনুভূত হয় না। সেজন্য এ সূরাটিকে বিভিন্ন সূরার মিশ্রণের সমষ্টি ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই।

**শানে নুযূল :** সূরায়ে আলে ইমরান ও সূরা আন নিসার অবতরণ কাল থেকে এ সূরার অবতরণ কাল পর্যন্ত পৌঁছতে সামাজিক অবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এমন এক সময় ছিলো যখন ওহুদ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের জন্য মদীনার পরিবেশকেও বিপদ সঙ্কুলে পরিণত করেছিল। আর এমন সময় সমগ্র আরব দেশে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নাজদের সীমানা হতে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত, অপরদিকে লোহিত সাগরের বেলাভূমি হতে মক্কার নিকট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ওহুদ যুদ্ধের আঘাত মুসলমানদের সাহস হিম্মতকে চূর্ণ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে দৃঢ় বাসনা ও সংকল্প সৃষ্টির জন্য তীব্র চাবুকের ন্যায় কাজ করে। তারা আহত শার্দুলের ন্যায় মরিয়া হয়ে উঠে এবং মাত্র তিনটি বছরের মধ্যেই গোটা অঞ্চলের পরিবেশের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। মুসলিমদের অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা ও আত্মোসর্গের ফলে মদীনার চতুর্দিকে দেড় দুইশত মাইল পর্যন্ত বিরোধীদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো। হেজাযের ইহুদীগণ মদীনার উপর হামলা করার পরিবর্তে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করলো। ইসলামকে খতম করার শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত করেছে। তাতেও তারা নির্মমভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর আরববাসীদের আর কোনো সন্দেহ থাকলো না যে, ইসলামী আন্দোলনকে চূর্ণ করার শক্তি আর কারও নেই। ইসলাম এখন আর একটি আকীদা, বিশ্বাস বা আদর্শের পর্যায়ে পড়ে নেই; বরং ইসলাম এখন বাস্তব রূপ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আর এর শাসন ক্ষমতা এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত জনতার গোটা জীবনকেই গ্রাস করে ফেলেছে।

এ কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী মুসলমানরা একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায়ই মসজিদ ও জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। প্রত্যেক মহল্লা বা গোত্রের জন্য একজন করে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইসলামের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন রচনা করে নিজস্ব আদালতসমূহের মাধ্যমে তা কার্যকরী করা হয়েছিল। লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়ের পুরাতন নীতি বন্ধ করে ইসলামী নিয়ম পন্থা চালু করা হয়েছিল। মিরাস বন্টন, বিবাহ-তালাক, পর্দা, অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ, যেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা দোষারোপের দণ্ড কার্যকরী হওয়ার ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবন একটি বিশেষ ধাচে গড়ে উঠতে শুরু করে ছিলো। মুসলমানদের উঠা-বসা, কথা-বার্তা, চাল-চলন, খানা-পিনা ও বসবাস করার পদ্ধতি, পোশাক-আশাক এক নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রূপ ধারণ করেছিল। ইসলামী জীবন ধারার এরূপ পরিপূর্ণ রূপায়ণ হওয়ার পর অমুসলিমগণ কিছুতেই আর এ আশা পোষণ করতে পারছিল না যে, মুসলিমগণ আর কোনো দিন তাদের সাথে মিলিত হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত কুরাইশ কাফিরদের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সংগ্রাম মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা ছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধির বাহ্যতঃ পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ প্রতিবন্ধকতা উৎপাটন করেছিল। এ সন্ধির ফলে নিরাপত্তা শুধু নিজেদের কর্মসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। আশপাশের অঞ্চলসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও তার ক্ষেত্র বিস্তারের অবাধ সুযোগ লাভ করেছিল। আর নবী করীম (সা) ইরান, তুরস্ক, মিসর ও আরবের বাদশা ও নৃপতিদের নামে লিখিত পত্রের মাধ্যমেই এর সূচনা করেছিলেন এবং সে সাথে বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারকগণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

**আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু :** এখানে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করা হয়েছে। মুসলিমগণ যখন প্রশাসকে পরিণত হলো, তাদের হাতে আসলো শাসন ক্ষমতা। আর ক্ষমতার নেশাই শাসক গোষ্ঠীকে যালিমে পরিণত করে। মযলুম অবস্থার অবসানের পর তদপেক্ষা আরও কঠিন

পরীক্ষার অধ্যয়ে তারা প্রবেশ করেছিল। এ জন্য ঈমানদার লোকদের বার বার এ উপদেশ দান করা হলো যে, তারা যেন সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যায়। কোনো দলের শত্রুতা যেন তাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যাতে তারা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলে।

তারা যেন ন্যায় নীতির উপর দণ্ডায়মান থেকে ইনসাফ কায়েম করে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকে, আর মনে রাখে তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার পুরোপুরি খবর রাখেন। যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা যে, তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর ইহুদী ও খৃস্টানদের মতো যারা আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাস ও এর সাথে মুনাফিকী করে, তাদের অবস্থান হবে জাহান্নাম।

**ব্যাখ্যা :** (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ.

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।"

তোমরা ইনসাফের পথে চলো, ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করো, এতটুকু বলেই আল্লাহ ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি বলেছেন, তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী হয়ে যাও। শুধু ইনসাফ কায়েম করাই তোমাদের কাজ হবে না, বরং ইনসাফের ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে তোমাদের আসল কাজ। যুলুম খতম করে সে জায়গায় আদল ও ন্যায় বিচার কায়েম করতে তোমাদের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। আদল ও ন্যায় বিচার কায়েম করার জন্য তোমাদের যে সহায়ক শক্তির প্রয়োজন, তোমাদের (ঈমানদারগণ) যোগান দিতে হবে সে সহায়ক শক্তি।

(খ) وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلاَّ تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজিত করে না তোলে,

যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে দূরে সরে পড়ো। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি কায়েম করো। এটা আল্লাহভীতির সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।"

দলের শত্রুতা সাধারণতঃ মানুষকে উত্তেজিত করে খারাপ কাজ করায়। ন্যায়নীতি থেকে দূরে সরে পড়ে মানুষ অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু আল্লাহভীতির কথা মানুষ ভুলে গেলে চলবে না। সর্বদা আল্লাহভীতি মনের মধ্যে জাগরূক থাকতে হবে। আল্লাহভীতির সাথে ন্যায়নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আল্লাহকে ভয় করে কাজ করলে মানুষ অন্যায় করতে পারে না।

(গ) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের যত ভুল ত্রুটি, মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট পুরস্কার পাবে।"

যারা ঈমানদার নয়, তাদের সৎ কাজের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেক আমল করবে সে পুরুষ অথবা মহিলা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা তার জীবন যাত্রার মান উন্নততর করে দেবেন।"

এখানে আল্লাহ্ ঈমানদারদের গুনাহখাতা মাফ করে বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। পরে আবার জীবন যাত্রার মান উন্নততর করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা দুনিয়ার মানুষ জীবন যাত্রার মান উন্নততর করার জন্য প্রায় সকলেই পাগল। কে কার চেয়ে বেশী ধনী হবে, কার কত বড়, কত সুন্দর কত বাড়ি, গাড়ি আছে ইত্যাদি। আবার আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.

"তোমাদেরকে বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে, এমনকি এ চিন্তায় তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।"

তবুও তোমাদের ধনশালী হওয়ার প্রতিযোগিতার অবসান হয় না।

(ঘ) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

"আর যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।"

১। অদৃশ্যে বিশ্বাস করা।

২। নামায কায়েম করা।

৩। আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খরচ করা।

৪। আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা।

৫। আখিরাতের উর ঈমান আনা।

যারা এ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর ঈমান না এনে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে নিজেদের পছন্দমতো পথ বেছে নিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছিলেন। জাহান্নাম তাদের জন্য নির্ধারিত।

**শিক্ষা :** ১। আল্লাহ্ভীতি সত্য ও ন্যায় পথে চলার সহায়ক।

২। অধিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সত্য ও ইনসাফ কায়েমের পথ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

৩। ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে তাদের বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে।

৪। যারা কুফরি করবে ও আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাস করবে তারা হবে জাহান্নামী।

**বাস্তবায়ন :** মানব সমাজে সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করার লোক সমাজে কম পাওয়া যায়। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, যুলুম ও নির্যাতন ক্রমে বেড়েই চলেছে। তাই সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ঝাণ্ডা নিয়ে আল্লাহ্ আমাদেরকে এগিয়ে চলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

## দারস : ৯

# কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধের নির্দেশ

## ৪৭. সূরা মুহাম্মদ

**মদীনায় নাযিল : আয়াত-৩৮, রুকূ-৪**

আলোচ্য আয়াত : ১-৪।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ. (٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ لا كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ. (٣) ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ. (٤) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لا فَاِمَّا مَنًّا م بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ج ذٰلِكَ ط وَلَوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "যেসব লোক কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ

কর্ম ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। (২) আর যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করছে এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যা নাযিল করা হচ্ছে তা মেনে নিচ্ছে– বস্তুতঃ তা পুরোপুরি মহাসত্য তাদের প্রভুর নিকট হতে, আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিচ্ছেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিচ্ছেন। (৩) এটা এ জন্যে যে, যারা কুফরি করছে তারা মিথ্যার অনুসরণ করছে এবং যারা ঈমান আনছে তারা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। (৪) অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো, এভাবে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ গ্রহণ করো, যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে। এটাই হলো তোমাদের করার মতো কাজ।"

**শব্দার্থ :** صَدُّوْا - বাধা দিয়েছে, سَبِيْلِ - পথ, اَضَلَّ - তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন, اَعْمَالَهُمْ - তাদের কর্মসমূহকে, اَلصّٰلِحٰتِ - নেকির, نُزِّلَ - অবতীর্ণ করা হয়েছে, اَلْحَقُّ - সত্য, كَفَّرَ - দূর করবেন, سَيِّاٰتِهِمْ - তাদের ত্রুটিসমূহ, اَصْلَحَ - সুসংহত করবেন, بَالَهُمْ - তাদের অবস্থা, بِاَنَّ - এ কারণে যে, اتَّبَعُوْا - তারা অনুসরণ করেছে, اَلْبَاطِلَ - বাতিলকে, اتَّبَعُوْا - তারা অনুসরণ করেছে, كَذٰلِكَ - এভাবে, يَضْرِبُ - বর্ণনা করেন, اَمْثَالَهُمْ - তাদের দৃষ্টান্তসমূহ, لَقِيْتُمْ - তোমরা মুকাবিলা করো, فَضَرْبَ - আঘাত করা, اَلرِّقَابِ - গর্দানে, حَتّٰى - এমনকি, اَثْخَنْتُمُوْا - তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও, فَشُدُّوْا - এরপর তোমরা শক্ত করবে, اَلْوَثَاقَ - বাঁধন, فَامًّا - অতঃপর হয়তো, مَنًّا - অনুকম্পা করবে, بَعْدُ - পরে, اِمَّا - কিম্বা, فِدَاءً - মুক্তিপণ নেবে, حَتّٰى - যতক্ষণ না, تَضَعَ - সংবরণ করবে, اَلْحَرْبُ - যুদ্ধ, اَوْزَارَهَا - তার অস্ত্রসমূহকে, ذٰلِكَ - এটা বিধান।

**নামকরণ :** ২ নং আয়াতের وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ - বাক্যাংশ হতে এর নাম গৃহীত। এতে যে মুহাম্মদ শব্দটি রয়েছে, একেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এ সূরার আর একটা প্রখ্যাত নাম, তা হলো قِتَالٌ - কিতাল, এ শব্দটি ২০ নং আয়াতের ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ বাক্যাংশ হতে গৃহীত।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়ে গোটা আরব-ভূমির সর্বত্র মুসলমানদেরকে যুলুম নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানানো হচ্ছিল এবং তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ করে দেয়া হচ্ছিল। মুসলিম জনতা চারদিক হতে মদীনার শান্তিপূর্ণ ভূমিতে একত্র হচ্ছিল। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা এখানেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে বসবাস করার সুযোগ দিচ্ছিল না। মদীনার ছোট ও স্বল্পায়তন জনপদটি চতুর্দিক থেকে কাফিরদের পরিবেষ্টনে আটক হয়ে পড়ছিল। মুসলমানদের দু'টি রাস্তাই মাত্র খোলা ছিলো। একটি হলো জাহিলিয়াতের নিকট আত্মসমর্পণ আর অপরটি হলো মুসলমানগণ তাদেরকে মারবার ও নিজে মরবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

এ সময় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে উচ্চতম মানের কাজের পথ দেখালেন যা পরিত্রাণের একমাত্র পথ। তিনি প্রথমে সূরা হজ্জে (৩৯ নং আয়াতে) তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। পরে সূরা আল বাকারায় (১৯০ নং আয়াতে) এর নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় দিলেন। কিন্তু এ দুঃসময় ও এহেন অবস্থায় যুদ্ধ করার যে কি অর্থ ও তাৎপর্য তা মদীনার সীমিত পরিসরে মুসলমানদের মুষ্টিমেয় একটা বাহিনী তারা এক হাজার পুরুষ যোদ্ধা সংগ্রহ করতেও সমর্থ ছিলো না। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম মুষ্টিমেয় মদীনার মুসলমানগণ না খেয়ে থেকেও সংগ্রহ সম্ভব ছিলো না। কেননা তখনও শত শত মুহাজিরদের পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়নি। আরবের লোকেরা চারিদিক থেকে অর্থনৈতিক বয়কট করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবার উপক্রম করছিল। এ অবস্থায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল যে, সমগ্র আরবের জাহিলিয়াতের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তরবারি নিয়ে বের হয়ে পড়ো।

**আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তু :** ঈমানদের লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং এ পর্যায়ে তাদেরকে জরুরি হিদায়াত দেয়াই এ সূরাটির আলোচ্য

বিষয়। এ কারণেই এ সূরাটির আরেক নাম قتال - (যুদ্ধ) রাখা হয়েছে। এ সূরাটিতে পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে ঃ প্রথমেই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, দু'টো দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রভাবে বর্তমান। একটা দল, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে এবং আল্লাহর দেখানো পথসমূহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আর দ্বিতীয় দলটি সে মহাসত্যকে মেনে নিয়েছে যা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এখন আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত হলো প্রথম দলটির সমস্ত চেষ্টা সাধনা কাজ কর্ম তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং শেষোক্ত দলটির অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

মুসলিম জনগণকে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক নির্দেশাবলী দিয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা, হিদায়াত ও পথের দিশা দানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পথে কুরবানী ও ত্যাগ তিতিক্ষা উপস্থাপনের সর্বোত্তম শুভ ফলের আশা দেয়া হয়েছে। সত্যের পথ তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কখনও নিষ্ফল হয়ে যাবে না বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত তারা তার উত্তম থেকে উত্তমতর ফল লাভ করতে থাকবে।

অতঃপর মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সহায়-সম্বলহীনতা এবং কাফিরদের সংখ্যাধিক্য ও সহায়-সম্বলের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে। এতে তাদের দুঃসাহস আর বেড়ে যাবে। বরং তারা যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে বাতিলকে রুখে দাঁড়ায় এবং কুফরের এই আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে সংঘাতে কুফরিশক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

অবশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিলো। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিলো যে, আরবে ইসলাম টিকে থাকবে কিনা? এ প্রশ্নের দাবী ছিলো এ যে মুসলমানগণ নিজেদেরকে এবং নিজেদের দ্বীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার

জন্য তাদের জীবন কুরবানী করবে ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিজেদের সমস্ত সহায় সম্পদ যথাসম্ভব কাজে লাগাতে কৃপণতা করবে না। মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। কোনো একটি দল যদি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কুরবানী করতে টালবাহানা করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের পরিবর্তে অপর কোনো দলকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।

**ব্যাখ্যা :** (ক) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ.
"যারা কুফরি করছে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ করে দিচ্ছেন।"

মুহাম্মদ (সা) যে শিক্ষা ও পথ নির্দেশনা পেশ করছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - তারা নিজেরা অন্যদেরকেও এ পথে আসতে বাধা দিচ্ছে।

আল্লাহর পথে আসার জন্য অন্যকে বাধা দেয়ার অনেক উপায় আছে। একটি হলো জোরপূর্বক কাউকে ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয় উপায় হলো ঈমানদার ব্যক্তির উপর চরম নির্যাতন ও যুলুম চালানো যে, তার পক্ষে ঈমানের উপর টিকে থাকা এবং এরূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে অন্যদের ঈমান গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পন্থা, সে বিভিন্ন কৌশলে দ্বীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। মানুষের হৃদয়ে এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে যার কারণে মানুষ এ দ্বীনের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বিধর্মী ব্যক্তিই তার সন্তান-সন্ততিকে কুফরি রীতি-নীতি অনুসারে লালন-পালন করে, তাই তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যায়। তাই প্রতিটি কুফরি সমাজ তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সমাজের রীতি-নীতি ও সংকীর্ণতা দ্বারা ন্যায় ও সত্যের পথে জগদ্দল পাথরের মতো বাধা হয়ে আছে।

সূরায়ে মায়িদার ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

আল্লাহ যা নাযিল করছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম।

اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ - আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। এ কথাটি অতি ব্যাপক। তাদের সমস্ত চেষ্টা-শ্রম সঠিক পথে ব্যয়িত হতে দেবেন না। এখন থেকে তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহির পথেই ব্যয়িত হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের ধারণায় যে কাজ ভাল মনে করে আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যেমন কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ন, হাজীদের খিদমত, মেহমানদের আপ্যায়ন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা এবং অনুরূপ আরও যেসব কাজকে আরবে ধর্মীয় সেবা এবং উন্নত নৈতিক কাজের মধ্যে গণ্য করা হতো, তা সব আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এ সকল সৎকাজের তারা কোনো প্রতিদান পাবে না। কারণ তারা নিজেরাই ঈমানহারা আর ঈমানহারা লোকদের কোনো আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে ন্যায় ও সত্যের পথকে বন্ধ করতে আর নিজেদের কুফরীভিত্তিক ধর্মকে আরবের বুকে জীবিত রাখার জন্য তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে চেষ্টা-সাধনা চালাচ্ছে, আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। এখন আর কোনো কৌশলই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করছে এতটুকু বললেই চলে। পৃথকভাবে وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ বলার প্রয়োজন থাকে না। তবুও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ না তাঁকে এবং তাঁর আনীত শিক্ষাসমূহকে মেনে না নেবে ততক্ষণ আল্লাহ, আখিরাত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সে যতই মেনে চলুক না কেন সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

একথাটি পরিষ্কারভাবে বলা বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। কারণ হিজরতের পর মদীনায় এমন সব লোকের সাথে উঠা-বসা ও আদান-প্রদান চলছিল যারা ঈমানের অন্যান্য অংশ মেনে নিলেও শেষ নবীর রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল- وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ لا كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ. - "বস্তুতঃ তাতো তাদের রবের পক্ষ থেকে

নাযিলকৃত অকাট্য সত্যকথা, আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।”

ঈমানদার লোকদের থেকে তাদের কৃত খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দেয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ (১) তাদের দ্বারা জাহিলী যুগে যে গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছিল, আল্লাহ্ তার হিসাব থেকে সবই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ঐসব গুনাহর কাজের জন্য এখন আর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (২) দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের যে পঙ্কিলতার মধ্যে তারা ডুবে ছিলো, আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছেন। এখন তাদের মনের গতি, অভ্যাস, আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তাদের জীবনের গতি, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড সৎ পথের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে।

তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন এ কথাটিরও দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো অতীতের অবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এখন পর্যন্ত তারা যে দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থায় ছিলো তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এখন তারা যুলুমের স্বীকার হওয়ার পরিবর্তে যালিমের মুকাবিলা করবে, শাসিত না হয়ে নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে এবং বিজিত না হয়ে বিজয়ী হয়ে থাকবে। সূরায়ে বাকারায় ২৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ. - “যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।”

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ.

“যারা কুফরি করেছে তারা বাতিলের আনুগত্য করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীগণ তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা সত্যের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ্ এভাবে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান বলে দেন।”

বাতিলের আনুগত্যকারী ও ঈমান গ্রহণকারীগণের পরিণাম কখনও এক সমান হতে পারে না। তাদের একদল বাতিলের আনুগত্য করতে বদ্ধপরিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কিন্তু অপর দলটি ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য গ্রহণ করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিচ্ছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে তাদের সঠিক অবস্থান বলে দেন।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لا فَاِمَّا مَنًّا ۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ج ذٰلِكَ.

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করো, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো, এভাবে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে; কিম্বা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে। এটাই হলো তোমাদের করার মতো কাজ।"

যে পূর্বাপর প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হচ্ছে এবং আয়াতের শব্দাবলী থেকেও একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল– فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - "যখন কাফিরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে" কথাটি ইঙ্গিত করে যে, তখনও মুকাবিলা হয়নি বরং মুকাবিলা হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। যে সময় সূরা হজ্জের ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে বলেন– اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ.

"অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা মযলুম এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।" সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর তাদের পছন্দ করেন না।"

যুদ্ধের এই সকল নির্দেশের কারণে ভয়ে ও আতঙ্কে মদীনার মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, মৃত্যু যেন তাদের মাথার উপর এসে হাজির হচ্ছে, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হচ্ছিল তা এর ২০ নং আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সূরায়ে আনফালের ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন−

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"এ কাফেরদের সাথে এমন যুদ্ধ করো যেন গোমরাহি ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা ফিতনা থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন।"

সূরায়ে আনফালের ৬৭-৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন−

مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ق وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"সারা দেশে শত্রুদেরকে ভালভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা চাও দুনিয়ার স্বার্থ অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।

আল্লাহর লিখন যা কিছু করেছো সে জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। কাজেই তোমরা যা কিছু সম্পদ লাভ করেছ তা খাও, কেননা, তা হালাল ও পাক-পবিত্র এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

সূরায়ে মুহাম্মদের চতুর্থ আয়াতটি কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম আয়াত যাতে যুদ্ধের আইন কানুন সম্পর্কে প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে যেসব বিধি-বিধান উৎসারিত হয় এবং তদনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে আমল করেছেন এবং ফিকাহবিদগণ এ আয়াত ও সুন্নাতের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যেসব হুকুম আহকাম রচনা করেছেন, তার সারসংক্ষেপ তাফহীমুল কুরআনের ৮ নং টীকায় পাওয়া যাবে।

**শিক্ষা :** ১। যারা কুফরি করছে, বাতিলের আনুগত্য করছে এবং অপরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং দেবেন।

২। যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত সকল কিছু মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো দূর করে তাদেরকে শুধরে দেবেন।

৩। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে বলেন, এসব কাফিরদের সাথে যখনই তোমাদের মুকাবিলা হবে তখন প্রথম কাজ হবে তাদেরকে হত্যা করা। শত্রুগণ পর্যুদস্ত হয়ে গেলে বেশ মজবুতভাবে তাদেরকে বন্দী করো। তারপর অনুকম্পা দেখাও বা মুক্তিপণ গ্রহণ করো, সেটা তোমাদের ইখতিয়ার।

**বাস্তবায়ন :** সম্মানিত পাঠক, আজকের এ দারসের শিক্ষায় যে কথাগুলো এসেছে, সেগুলো ঈমানদারদের জন্য সমাজে কার্যকরী করার সময় যখন আসবে তখন আল কুরআনের নির্দেশানুসারে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাওফীক দান করেন, আমিন ॥

# দারস : ১০

# একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত, নামায এবং যাকাত প্রতিষ্ঠাই সত্য দীন

## ৯৮. সূরা আল বাইয়িনাহ

মাক্কায় নাযিল : আয়াত-৮, রুকূ-১

আলোচ্য আয়াত : ৫।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٥) وَمَآ أُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।"

**শব্দার্থ :** وَ - এবং, مَا - না, أُمِرُوْا - তারা আদিষ্ট হয়েছে, اِلاَّ - এ ছাড়া, لِيَعْبُدُوْا - তারা ইবাদত করুক, مُخْلِصِيْنَ - খালেসভাবে, الدِّيْنَ - দীনকে, حُنَفَاءَ - একমুখী হয়ে, يُقِيْمُوْا - তারা কায়েম করবে, الصَّلٰوةَ - নামায, يُؤْتُوْا - তারা দেবে, ذٰلِكَ - এটাই, دِيْنُ - দীন, الْقَيِّمَةِ - সঠিক।

**নামকরণ :** প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ اَلْبَيِّنَةُ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। اَلْبَيِّنَةُ শব্দের অর্থ অকাট্য দলীল।

**নাযিল হওয়ার সময়কাল :** এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে হযরত আয়েশা (রা) একে মাক্কী সূরা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবদুল মুনইম ইবনুল ফারাস এ সূরাটি মাক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

**বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :** আল কুরআনের সূরাগুলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে আলোচ্য সূরাকে সূরায়ে আলাক ও সূরায়ে কদরের পরে স্থান দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। সূরায়ে আলাকে সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া অহী লিখা হয়েছে। সূরায়ে কদরে বলা হয়েছে সেগুলো কবে নাযিল হয়? আর এই সূরায় এ পবিত্র কালামের সাথে একজন রাসূল পাঠানো বিশেষ প্রয়োজন ছিলো কেন, তা বলা হয়েছে।

আহলে কিতাব ও মুশরিক নির্বিশেষে দুনিয়াবাসী কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। একজন রাসূল পাঠানো ছাড়া এ কুফরির বেড়াজাল থেকে তাদেরকে বের করে আনা সম্ভব নয়। এ রাসূলের অস্তিত্ব তাঁর রিসালাতের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে এবং তিনি লোকদের সামনে আল্লাহর কিতাবকে তাঁর আসল ও সঠিক আকৃতিতে পেশ করবেন, অতীতের আসমানী কিতাবসমূহে যেমন বাতিলের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল তেমন কোনো মিশ্রণ তাতে থাকবে না এবং তা হবে পুরোপুরি সত্য ও সঠিক শিক্ষা সমন্বিত।

তারপর আহলে কিতাবদের গোমরাহি তুলে ধরে বলা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন ভুল পথে ছুটে বেড়ানোর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি। বরং তাদের নিকট সঠিক পথের সুস্পষ্ট বর্ণনা এসে যাবার পরপরই তারা ভুল পথে পাড়ি দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তাদের এ ভুলের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এখন যদি আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে সত্য আরেক দফা সুস্পষ্ট হবার পরও যদি তারা দিশেহারার মতো ভুল পথে ছুটে বেড়াতে থাকে তাহলে তাদের দায়িত্বের বোঝা বেড়ে যাবে অত্যধিক।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবী এসেছিলেন এবং যেসব আসমানী

কিতাব নাযিল হয়েছিল সেসবে একটি মাত্র হুকুম দেয়া হয়েছিল, সেটি হচ্ছে ঃ সব পথ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর ইবাদত, বন্দেগী ও আনুগত্যের সাথে আর কারো ইবাদত, বন্দেগী, উপাসনা ও আনুগত্য শামিল করো না। নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। চিরকাল এটিই সঠিক দীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাবরা এই আসল দীন থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ধর্মে যেসব নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে নিয়েছে সেগুলো সবই বাতিল। আর আল্লাহর এ নবী যিনি এখন এসেছেন, তিনি তাদেরকে এ আসল দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিচ্ছিলেন।

পরিশেষে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যারা এ রাসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের শাস্তি চিরন্তন জাহান্নাম। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্মের পথ অনুসরণ করবে এবং দুনিয়ায় তাকওয়ার জীবন-যাপন করবে তারাই আশরাফুল মাখলুকাত। জান্নাতই তাদের পুরস্কার, চিরকাল সেখানেই তারা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

ব্যাখ্যা : (ক) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

"তাদেরকে তো এছাড়া আর কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটাই যথার্থ ও সঠিক দীন।"

হযরত মুহাম্মদ (সা) যে দীনটি পেশ করেছেন, আহলে কিতাবদের কাছে যেসব কিতাব নাযিল হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে যেসব নবী-রাসূল এসেছিলেন, তাঁরাও তাদেরকে সে একই দীনের তালীম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেসব বাতিল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ-কর্মের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার কোনোটিরও হুকুম তাঁরা দেননি। সবসময় সত্য ও সঠিক দীন একটিই ছিলো। আর সেটি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় একমাত্র ধর্ম ইসলাম। তাঁর বন্দেগীর সাথে আর কারো বন্দেগীর মিশ্রণ করা যাবে না। আল্লাহর দীন সুস্পষ্ট, আকীদা-বিশ্বাস সহজ-সরল ও জটিলতামুক্ত, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকে শুধুমাত্র এ আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করে যে, আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় এবং সর্বোতভাবে তাঁর প্রতি একাগ্র থাকে আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। বস্তুত এটাই চিরস্থায়ী বিধান। আল্লাহর দীনের চিরন্তন মূলনীতি এটাই যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। শিরক ও মুশরিকদেরকে বর্জন করতে হবে। অন্তরে নির্ভেজাল আকীদা-বিশ্বাস স্থাপন এবং সে আকীদার আলোকে আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়। এ ব্যয়ের নাম হচ্ছে যাকাত। যে ব্যক্তি এ সকল মূলনীতি বাস্তবায়িত করবে সে ঈমানকেই বাস্তবরূপ দান করবে। একই দীন ও একই আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে একের পর এক রাসূলদের আবির্ভাব ও রিসালাতের আগমন ঘটেছে। আহলে কিতাবকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং এটাই সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দীনের অন্তর্ভুক্ত। এ দীনে কোনো অস্পষ্টতা নেই, জটিলতা নেই। এ আকীদা-বিশ্বাসে কোনো দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের উস্কানি ও প্ররোচনা নেই। আল্লাহর এরূপ সহজ-সরল ও উদার দ্বীনের সাথে মানব রচিত জটিল ও বিতর্কিত আদর্শের কোনো তুলনা হয় না।

আল্লাহ বলছেন, وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا.-
"(হে নবী)! তুমি দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে।"

(খ) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ.

"এটি আল্লাহর কিতাব এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।"

(গ) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে সরল সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।"

এ সকল প্রমাণ ব্যতীত আল কুরআনের বহু জায়গায় একত্ববাদের ও আল্লাহর সত্য দীনের প্রমাণ নিহিত আছে।

**শিক্ষা :**

১। দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

২। সকল অংশীদারিত্ব ছেড়ে দিয়ে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

৩। সে দীনের মধ্যে নামায ও যাকাতের আদেশ আছে তাই যথার্থ ও সঠিক দীন।

৪। ইসলামই হলো আল্লাহর মনোনীত দীন।

**বাস্তবায়ন :** এ দারসের আলোকে আমাদের মানব সমাজকে সংস্কার করতে হবে দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন।" আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো জিন, ফেরেশতা, গাছপালা এমনকি অন্য কেউই মানুষের ইবাদত পেতে পারে না। ইবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ, তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই, তিনি একাই পূর্ণ। এ বিশ্বাসকেই তাওহীদ বলা হয়। সে তাওহীদের ঝাণ্ডা নিয়েই মুসলিমগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে নামায, যাকাত আদায়কারী ও তাওহীদের ঝাণ্ডা বহনকারী হিসেবে কবুল করেন, আমীন। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

## দারস : ১১

# নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে

## ২৯. সূরা আল আনকাবূত

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-৬৯, রুকূ-৭**

**আলোচ্য আয়াত : ৪৫।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٤٥) اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৩) "(হে নবী) অহির মাধ্যমে তোমার নিকট যে কিতাব পাঠানো হয়েছে, তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো। নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্‌র যিকির তা হতেও অধিক বড় জিনিস, আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করছো।

**শব্দার্থ :** اُتْلُ - (হে নবী) তেলাওয়াত করো, اُوْحِىَ - অহী করা হয়েছে, اِلَيْكَ - তোমার প্রতি, اَقِمِ - কায়েম করো, اَلصَّلٰوةُ - নামায, تَنْهٰى - বিরত রাখে, اَلْفَحْشَآءِ - অশ্লীলতা, اَلْمُنْكَرِ - খারাপ কাজ হতে, لَذِكْرُ - অবশ্যই স্মরণ, تَصْنَعُوْنَ - তোমরা সম্পন্ন করছো।

**নামকরণ :** এ সূরার একচল্লিশ নম্বর আয়াতের كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ - থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। عَنْكَبُوْتِ - অর্থ মাকড়সা।

**নাযিলের সময় :** এ সূরার ৫৬ নং আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে

জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকাংশ বিষয়বস্তুগুলোর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এ কথাই সমর্থন করে। এতে মুনাফিকদের সম্পর্কে কথা এসেছে। মুনাফিকতো মদীনায় দেখা দিয়েছিল, মক্কায় নয়। আবার কেউ বলেন এখানে যে মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে তারা তো সে মুনাফিক যারা কাফেরদের যুলুম-অত্যাচার এবং কঠিন দুঃসহ দৈনিক নির্যাতনের ভয়ে মুনাফিকী আচরণ করছিল। আর এ নমুনার মুনাফিক মদীনায় নয়, মক্কাতেই ছিলো। কাজেই মদীনায় হিজরত করার পূর্বে 'হাবশায় সাহাবীরা হিজরত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। সমগ্র সূরাটির সম্পূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবেও সর্বাত্মক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হবে যে, এ সূরা মক্কী জীবনের শেষ সূরা নয়, বরং হাবশায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়া সূরা হিসেবেই প্রমাণিত হবে।

**আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য :** এ সূরাটি পড়ার সময় সূরার বিবরণ থেকেই বুঝা যায় যে, মক্কা শরীফে মুসলমানদের উপর কঠিন বিপদ, কঠোর নির্যাতন ও পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের বিরোধিতা চলছিল। কাফেররা নওমুসলিমদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো। এরূপ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সূরাটি নাযিল হয়। এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার ঈমানদার লোকদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প, সাহস-হিম্মত ও অনমনীয় মনোভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং দুর্বল ঈমানদার লোকদের লজ্জা দিতে চেয়েছেন। মক্কার কাফেরদেরকে কঠোর ভাষায় শাসন করা হয়েছে। সত্যের বিরোধিতাকারীগণ তাদের অপরাধের কারণে যে দুঃখজনক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, দুর্বল ঈমানওয়ালাগণ যেন সে পরিণতির সম্মুখীন না হয়।

সে সময়ের পিতামাতাগণ তাদের যুবক সন্তানদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বলতো যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করো এবং আমাদের ধর্মের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। নওমুসলিম যুবকদেরকে পিতামাতাগণ বলতো, তোমরা যে কুরআনের উপর ঈমান এনেছো, সে কুরআনেই তো 'পিতামাতার হক সবচেয়ে বেশী' বলছে। কাজেই আমরা

বলি তা মেনে নাও। নতুবা ঈমানের বিপরীত কাজ হয়ে যাবে। কোনো কোনো নওমুসলিমকে তার বংশের লোকেরা বলছিল আযাব আর সওয়াব যাই হোক তা আমাদের মাথায়। তোমরা মুহাম্মদ-কে ত্যাগ করো। আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করলে আমরা অগ্রসর হয়ে বলবো, হে বারে এলাহী এ বেচারাদের কোনো দোষ নেই। আমরাই এদেরকে বাধ্য করেছি। কাজেই ধরতে হয় আমাদেরকে ধরুন।

অতীতকালের নবী-রাসূলগণের উপর কঠিন মুসিবত দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপতিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি শান্তি ও সাহায্য নেমে আসে। কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। আল্লাহর পাকড়াও করায় যদি বিলম্ব হয় তবে মনে করো না যে পাকড়াও আর বুঝি হবে না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত ও স্পষ্ট হয়ে আছে। তাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে এবং নবীগণকে আল্লাহ সাহায্য করেছেন। মুসলিমদেরকে আরও হেদায়েত দেয়া হয়েছে এ বলে যে, যুলুম ও নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে থাকে, তবে ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে ঘর বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর দুনিয়াতো ছোট নয়। যেখানেই শান্তিময় আল্লাহর বন্দেগী করতে পারো সেখানেই চলে যাও। তারপর কাফেরদেরকেও তাওহীদ ও পরকাল এ দু'টো মহাসত্যকে দলিল প্রমাণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিরকের প্রতিবাদ করে উহাকে বাতুলতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী আমাদের নবীর যাবতীয় শিক্ষার সত্যতাই বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রমাণ করে তুলে ধরছে।

**ব্যাখ্যা :** (ক) اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ - 
"তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো।"

যদিও দেখা যায় নবী করীম (সা)-কে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, আসলে কিন্তু সমগ্র মুসলিম উম্মাহকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সে সময় তাদের

উপর যেসব যুলুম-অত্যাচার চালানো হচ্ছিল সেসবের মুকাবিলা করার জন্য পেছনের চার রুকুতে সবর, দৃঢ়তা ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার উপদেশ দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন সে সাথে শিক্ষাগুলো অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযের মাধ্যমে বাতিলের ঝড়-ঝঞ্ঝায় শুধুমাত্র টিকে থাকাই নয় বরং তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। যে কুরআন তেলাওয়াত মানুষের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার হৃদয়ে আঘাত হানতে পারে না, তা তাকে কুফরির বন্যা প্রবাহের মুকাবিলায় ঈমানের উপর টিকে থাকার শক্তিও দান করতে পারে না।

কুরআন তেলাওয়াতের পরে যেসব মানুষের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও কর্মনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসে না বরং তেলাওয়াতের পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করতে থাকে। এই তেলাওয়াতের কি কোনো অর্থ হতে পারে? নবী করীম (সা) বলেন : ما امن بالقران من استحل محارمه. "আল কুরআনের হারাম করা জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি। (তিরমিযী, হযরত সুহাইব রূমী রা.)।

এ ধরনের তেলাওয়াত মানুষকে আল্লাহর মুকাবিলায় আরও বেশী বিদ্রোহী ও নির্লজ্জ করে তোলে। আল কুরআন পড়ে তুমি যদি জেনে নিয়ে থাকো তোমার রব তোমাকে কোন্ কাজ করতে হুকুম দেন, কোন্ কাজ করতে নিষেধ করেন, আবার তুমি তার বিপরীত কর্মনীতি অবলম্বন করো তাহলে এ কুরআন তোমার বিরুদ্ধে দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ইসলামী জীবনদর্শনের মৌল উৎস, বিশ্ব প্রতিপালকের প্রত্যক্ষ বাণী, জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলধারার ও যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক সমাধানদাতা। যা অমুসলিম কর্তৃক স্বীকৃত– "لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ।" উপাধিতে ভূষিত আরবী ভাষায় অবতীর্ণ পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। যার সাবলীল ভাষা, ভাব, ছন্দের ব্যঞ্জনা, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শব্দ ঝংকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। এর রচনা শৈলীর মধ্যে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

"ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ."

আল কুরআন অনুসরণে মানুষ দুনিয়ার জীবনে পায় পরম শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং পরকালীন জীবনে পায় অনন্ত জীবনের সন্ধান। তাই এটা বিশ্ব মানবতার জন্য Complete code of life. শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই আল কুরআনকে বুঝে শুনে পড়তে হবে এবং আদেশ নিষেধ মানতে হবে।

এবার আসে নামাযের কথা, মিরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এর পূর্বে নবী-রাসূলগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকআত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে দুই রাকআত আদায় করতেন। এছাড়া তিনি (রাসূল সা) তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা ও পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন–

'নামায কায়েম করো'। কায়েম মানে প্রতিষ্ঠাত করা।

নামায প্রতিষ্ঠা মানে সকল মুসলমান যথাসময়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে সাহাবীগণ জামায়াতে নামায আদায় করেছেন।

নামায কায়েমের আরেকটি দিক হলো, মুসলমানদের মধ্যে আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা বোধ জাগ্রত করা। ধনী-গরীব সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রমাণ করে তারা সকলে সমমর্যাদার অধিকারী।

নামাযে মুসলিমগণ যা কিছু আল্লাহর সামনে উচ্চারণ করে, সেই কথাগুলো জীবনের অন্যসময়ে কাজেকর্মে মেনে চলবে তথা বাস্তবায়ন করবে এটিও নামায প্রতিষ্ঠার আরেকটি দিক।

নামাযের গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকটি দিক হচ্ছে–

১। নামায ঈমান ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়। বেনামাযী ঈমানদার থাকার কোন সুযোগ নেই।

২। اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ. - অর্থাৎ নামায দীনের স্তম্ভ।

৩। اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ. - অর্থাৎ নামায জান্নাতের চাবি।

৪। اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. - অর্থাৎ নামায ঘুম থেকে উত্তম।

৫। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করবে, শরীরের ময়লার ন্যায় তার গুনাহসমূহ ঝরে যাবে অর্থাৎ মাফ করে দেয়া হবে।

৬। ঈমান ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নামায।

৭। নামাযের হিসাব সকলের আগে নেয়া হবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

**নামাযের ফযীলত :**

(খ) اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. - "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

নামাযীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, সে অশ্লীল ও খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত হবে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে নামাযকে এখানে পেশ করা হয়েছে। মক্কার অনৈসলামী সমাজে মুসলিমগণ যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মুকাবিলা করার জন্য তাদের বস্তুগত শক্তির চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিলো নৈতিক শক্তির। এ নৈতিক শক্তির উদ্ভব ও তার বিকাশ সাধনের জন্য কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেসকল দুষ্কৃতিতে তোমরা লিপ্ত ছিলে এবং বর্তমানেও লিপ্ত আছো, ইসলাম গ্রহণ করার পর নামায কায়েম করার মাধ্যমে তোমরা এ সকল দুষ্কৃতি ও জাহেলী প্রথা থেকে মুক্ত হতে পারো।

নৈতিক দুষ্কৃতিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী লোকেরা নৈতিকতার মাধ্যমে শুধুমাত্র দুনিয়ায় ও আখিরাতেই লাভবান হয় না বরং এর ফলে তারা নিশ্চিতভাবেই এমন সব লোকের উপর ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যারা বিভিন্ন পন্থায় নৈতিক দুষ্কৃতির স্বীকার হয়ে গেছে।

(গ) وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. - আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ শুধুমাত্র অসৎকাজ

থেকে বিরত থেকেই সে ক্ষান্ত হয় না। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে সে সৎকাজে উৎসাহিত এবং সুকৃতি সম্পাদনে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ নিজেই অনেক বড় জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের আর কোনো কাজ এর চেয়ে বেশী ভাল হতে পারে না। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ - "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো" (বাকারা : ১৫২ আয়াত)। তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করার চেয়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্মরণ করা অনেক বেশী বড় জিনিস। আরও একটি সূক্ষ্ম অর্থ এখানে দেখানো হলো। হযরত আবু দারদা (রা)-এর সম্মানিতা স্ত্রী বলেছেন, আল্লাহর স্মরণ নামায পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। যখন মানুষ রোযা রাখে, যাকাত দেয়, ফিৎরা দেয়, রুগীর সেবা ইত্যাদি সৎকাজ করে, তখন সে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করে। অনুরূপ যখন কোনো ব্যক্তি অসৎ কাজ করার সুযোগ পাওয়ার পর তা থেকে দূরে থাকে, তখন এটাও হয় আল্লাহকে ভয় করার ফল। এ জন্য আল্লাহর স্মরণ একজন মুমিনের সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

**শিক্ষা :** ১। বুঝে শুনে আল কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে।

২। ভয়-ভীতিসহকারে ধীরস্থিরভাবে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

৩। নিশ্চয়ই নামায নামাযীকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

৪। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ সৎকাজ করে, আবার আল্লাহর ভয়েই মানুষ সুযোগ পেয়েও অসৎকাজ থেকে ফিরে আসে।

৫। আল্লাহর স্মরণ একজন মুমিনের সামগ্রিক জীবনে পরিব্যাপ্ত থাকলে সেই জীবন সার্থক।

**বাস্তবায়ন :** হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম প্রচারের সময় কুরাইশ কাফেরগণ নবমুসলিমদের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল তা মনুষ্যত্বকে ছাড়িয়ে বর্বরতার যুগকেও হার মানিয়েছিল। সেসব সমস্যা

সংকটের মুকাবিলা করার জন্য অনবরত সবর, দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার উপদেশ দেবার পর এখন তাদেরকে বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু'টি জিনিসই মুমিনকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা ও দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝঞ্ঝার মুকাবিলায় শুধুমাত্র টিকে থাকতে নয় বরং তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। আমরাও আমাদের সমাজে কুরআন অধ্যয়ন ও নামায এমনভাবে বুঝে শুনে ভয়-ভীতিসহকারে জওয়াবদিহিতার খেয়াল নিয়ে পড়বো এবং সকলকে এ ব্যাপারে উপদেশ দেবে যাতে সমাজের সকল মানুষ আল কুরআন ও নামাযের দ্বারা বাতিলের মুকাবিলা করতে পারে।

## দারস : ১২

# সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

### ৩৬. সূরা ইয়াসীন

মক্কায় নাযিল : আয়াত-৮৩, রুকূ-৫

আলোচ্য আয়াত : ৭৭-৮৩।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٧٧) اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ. (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ. (٧٩) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ (٨٠) نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ. (٨١) اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ. (٨٢) اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. (٨٣) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাদেরকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। (৭৮) এখন সে আমাদের উপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির কথা সে ভুলে যায়। সে বলে : 'কে এ অস্থিগুলোকে জীবন্ত করবে, যখন এগুলো পঁচে গলে গেছে' (৭৯) তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন, যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন। (৮০) তিনিই তোমাদের জন্যে সবুজ গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো। (৮১) যিনি আকাশ ও যমীন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের মতো আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। (৮২) তিনি যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি তাকে হুকুম করেন, 'হয়ে যাও', আর অমনি তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র মহান সেই সত্তা যাঁর হাতে রয়েছে সব জিনিসের কর্তৃত্ব। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

**শব্দার্থ :** اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ - মানুষ কি দেখে না? خَلَقْنٰهُ - তাকে আমরা সৃষ্টি করেছি, نُطْفَةٍ - শুক্রবিন্দু, خَصِيْمٌ - ঝগড়াটে, مُبِيْنٌ - সুস্পষ্ট, ضَرَبَ পেশ করে, مَثَلاً - উপমা, نَسِيَ - সে ভুলে যায়, خَلْقَهُ - তার সৃষ্টিকে, يُحْيِ - প্রাণ সঞ্চার করবে, اَلْعِظَامَ - অস্থিতে, رَمِيْمٌ - পঁচাগলা, يُحْيِيْهَا - তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন, اَنْشَاَهَا - তা সৃষ্টি করেছে, اَوَّلَ - প্রথম, مَرَّةً - বার, بِكُلِّ - সবকিছু সম্পর্কে, خَلْقٍ - সৃষ্টির, عَلِيْمٌ - সম্যক অবগত, اَلَّذِيْ - যিনি, جَعَلَ - সৃষ্টি করেছেন, لَكُمْ - তোমাদের জন্য, اَلشَّجَرِ - গাছ, اَلاَخْضَرِ - সবুজ, نَارًا - আগুন, تُوْقِدُوْنَ - চুলা ধরাও, اَوَلَيْسَ - নন কি, اَلسَّمٰوٰتِ - আকাশ, اَلاَرْضِ - পৃথিবী, بِقٰدِرٍ - সক্ষম, يَخْلُقُ - সৃষ্টি করবেন, اَلْخَلاَّقُ - মহাস্রষ্টা,

اَلْعَلِيْمُ - সুদক্ষ, اَمْرُهُ - তাঁর নির্দেশ হয়, اَرَادَ – ইচ্ছে করেন, كُنْ - হও, فَيَكُوْنُ - হয়ে যায়, فَسُبْحٰنَ - অতএব মহান পবিত্র, مَلَكُوْتُ - কর্তৃত্ব, اِلَيْهِ - তাঁরই দিকে, تُرْجَعُوْنَ - তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

**নামকরণ :** যে দু'টি বিচ্ছিন্ন অক্ষর يٰس দিয়ে সূরাটি আরম্ভ করা হয়েছে, ঐ অক্ষর দু'টিকেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল :** সূরার বর্ণনাভঙ্গি চিন্তা বিবেচনা করলে মনে হয় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের মাঝামাঝির শেষভাগ অথবা শেষকালে নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে একটি।

**বিষয়বস্তু ও আলোচ্যবিষয় :** নবী করিম (সা)-এর নবুয়তের উপর কুরাইশ কাফেরদের অবিশ্বাস ও যুলুম-বিদ্রূপের পরিণামের ভয় দেখানোই আলোচনার সার কথা। বার বার প্রবল ও সুস্পষ্ট ভয় দেখানোর সাথে সাথে যুক্তির দ্বারা বিষয়বস্তু বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

**তিনটি বিষয়ের উপর যুক্তি দেখানো হয়েছে :**

ক. তাওহীদের উপর বিশ্বের অসংখ্য নিদর্শন ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে।

খ. রিসালাতের উপর নবী করিম (সা)-এর দায়িত্ব পালনে নিঃস্বার্থ ও গরজহীনভাবেই সমস্ত শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। তিনি সেসব বিষয়ে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তা পুরাপুরি বিবেকসম্মত, তাতে মানুষের নিজেদেরই কল্যাণ ছিলো।

গ. আখেরাতের উপর প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে।

এ যুক্তি প্রমাণের শক্তির উপর ভীতি প্রদর্শন, তিরস্কার ও সতর্ক করার বিষয়বস্তু অত্যন্ত জোরেশোরে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হৃদয়ের তালা খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার সামান্যতম যোগ্যতাও আছে তারা যেন কুফুরির উপর বহাল থাকতে না পারে।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ মাকাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেন,

يس قَلْبُ الْقُرْآنِ - "এ ইয়াসীন সূরাটি কুরআনের হৃদয়।" এটি সূরায়ে ফাতেহার অনুরূপ। উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে সূরায়ে ফাতেহাকে। কারণ এর মধ্যে কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার এসে গেছে। এদিকে ইয়াসীনকে কুরআনের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দিল বলা হয়েছে এ জন্যে যে, সে কুরআনের দাওয়াতকে জোরেশোরে পেশ করে; যার ফলে জড়তা কেটে যায় এবং প্রাণপ্রবাহ গতিশীল হয়।

নবী করীম (সা) আরও বলেন, اقْرَوُا سُوْرَةَ يس عَلَى مَوْتَكُمْ "তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করো।" এর দ্বারা মৃত্যুর সময় ইসলামী আকীদা (বিশ্বাস) তাজা হয়। তার মনের পর্দায় আখেরাতের পূর্ণ চিত্র ভেসে উঠে। কোন্ সব মন্জিল তাকে অতিক্রম করতে হবে, তা সে দেখতে পায়।

**ব্যাখ্যা :** اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.
(৭৭) "মানুষ কি দেখে না তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে?"

৪৮নং আয়াতে আখেরাত অবিশ্বাসীগণ নবী করিম (সা)-কে প্রশ্ন করে– "কিয়ামতের হুমকি কবে পূর্ণ হবে?" তাদের প্রশ্ন কিয়ামতের তারিখ জানার জন্য নয়; বরং তারা মানুষের পুনরুত্থানকে অসম্ভব ও যুক্তি বিরোধী মনে করতো। এ জন্যই তাদের প্রশ্নের জবাবে আখেরাতের সত্যতার ব্যাপারে যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে যুবাইর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় মক্কার কাফের সরদারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (আস ইবন ওয়েল) কবরস্থান থেকে কোনো লাশের একটি গলিত হাড় নিয়ে আসে এবং নবী করিম (সা)-এর সামনে সেটি ভেঙ্গে ফেলে এবং তার চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, "হে মুহাম্মদ তুমি বলছো মৃতদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে। বলো– এ পঁচা-গলা হাড়গুলোকে আবার কে জীবিত করবে?" সঙ্গে সঙ্গেই এ আয়াতগুলোতে এর জবাব দেয়া হয়েছে: শুক্রকীট, যার মধ্যে নিছক একটি প্রাথমিক জীবন-কীট ছাড়া আর কিছুই

ছিলো না। তাকে উন্নতি দান করে আমি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছি যার ফলে সে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হয়ে তার মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি-জ্ঞান এবং তর্ক-বিতর্ক, আলাপ আলোচনা, যুক্তি প্রদর্শন ও বাগ্মীতার এমন সব যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। এমন কি এখন সে নিজের স্রষ্টাকেও বিদ্রূপ করতে এগিয়ে আসছে।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ.

(৭৮) "এখন সে আমার উপর উপমা প্রয়োগ করে এবং সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, বলে, "এ হাড়গুলো যখন পঁচে-গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে?"

মানুষ এখন আমাকে সৃষ্টিকুলের মতো অক্ষম মনে করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষ যেমন কোনো মৃতকে জীবিত করতে পারে না ঠিক তেমনি আমিও পারি না।

মানুষ এ কথা ভুলে যায় যে, আমি নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে এমন প্রাথমিক জীবন-কীট সৃষ্টি করেছি, যা তার সৃষ্টির উৎসে পরিণত হয়েছে। তারপর এ কীটকে লালন-পালন করে এত বড় করে দিয়েছি, যার ফলে সে আজ আমার সম্মুখে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ.
نِ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.

(৭৯) "তাকে বল, এদের তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন।

(৮০) তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো।"

তিনি সবুজ বৃক্ষসমূহে এমন দাহ্যবস্তু রেখে দিয়েছেন যা ব্যবহার করে তোমরা কাঠের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে থাকো। অথবা এর মাধ্যমে 'মার্‌খ' ও 'আফার' নামক দুইটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করেন। এ গাছ দু'টির কাঁচা

ডাল দিয়ে আরববাসীরা একটার উপর আরেকটাকে রেখে ঘষা দিলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়তো। প্রাচীন যুগে গ্রামীণ আরবের লোকেরা আগুন জ্বালাবার জন্য চকমকি বা দিয়াশলাই হিসেবে এ ডাল ব্যবহার করতো এবং সম্ভবত আজও করে থাকে।

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ.

(৮১) "যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা"

পৃথিবী ও আকাশ হচ্ছে এক বিস্ময়কর, বিশাল ও রহস্যময় জগৎ। এই যে পৃথিবী, যেথায় আমরা বসবাস করি, এখানে আমাদের সাথে আরও কোটি কোটি প্রাণী বাস করছে। এর আয়তন, প্রকৃতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা অতি সামান্যই জানতে পেরেছি। পৃথিবী নামক সূর্যের গ্রহটি সূর্যের আলো-তাপেই টিকে আছে। সূর্যটি হচ্ছে একটিমাত্র ছায়াপথের অধীন দশ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি। সূর্য নামক নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের নিকটবর্তী জগৎ। এ ছায়াপথ ব্যতীত মহাশূন্যে আরও অনেক ছায়াপথ আছে। জ্যোতির্বিদরা তাদের সীমিত দূরত্বের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ পর্যন্ত দশ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পেলে ছায়াপথের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। আমাদের ছায়াপথ ও তার নিকটবর্তী ছায়াপথের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় সাতশত পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ (এক আলোকবর্ষ হচ্ছে চব্বিশ বিলিয়ন মাইলের সমান)। এছাড়াও বিশাল বিশাল বলয় দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জ। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও সীমিত দৃষ্টিশক্তিতে এ বিশাল সৌর জগতের অতি সামান্য অংশই ধরা পড়েছে। এ অগণিত সৌর জগতের প্রতিটির রয়েছে অসংখ্য কক্ষপথ, যাকে কেন্দ্র করে এগুলো আবর্তন করছে। আবার এদের কেন্দ্র করে আবর্তন করছে অন্যান্য গ্রহ। এগুলো বিরামহীনভাবে ছুটে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই, বিশৃঙ্খলা নেই। ব্যতিক্রম হলে এই দৃশ্যমান জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত

এবং সংঘর্ষ বেঁধে যেত। মহাশূন্যে ছোট ছোট কণার মতো কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র ভেসে বেড়ায়, এদের চিত্রায়ন ও কল্পনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এর বিশালতার কথা চিন্তা করলে আমাদের মাথা ঘুরে যায়।

যে মহান আল্লাহ এ বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না? এই বিশাল জগতের তুলনায় মানুষের অস্তিত্ব কতটুকু? নিশ্চয়ই তিনি মহানস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। তিনি সবকিছুই পারেন। তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি কেবল 'হও' নির্দেশ করতেই সবকিছু হয়ে যায়।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

(৮২) "তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' আর তখনই তা হয়ে যায়।

(৮৩) অতএব পবিত্র তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

এই 'কোনো কিছু' বলতে আকাশও হতে পারে, পৃথিবীও হতে পারে। তেমনিভাবে একটি মশাও হতে পারে অথবা একটি পিঁপড়াও হতে পারে। মোটকথা আল্লাহর নির্দেশ 'হও' এর ক্ষেত্রে সবকিছুই সমান। আল্লাহর নির্দেশ এর সামনে (আল্লাহর ইচ্ছার সামনে) কঠিন, সহজ, কাছে, দূরে বলতে কিছু নেই। কোনো কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহর কাম্য হলে তার জন্য তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝানোর জন্য তার সীমিত জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির উপযোগী পন্থাই গ্রহণ করে থাকেন।

শেষ আয়াতে রাজত্ব শব্দ ব্যবহার করে গোটা সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সে মহান আল্লাহর হাতেই, এই কঠিন বাস্তব সত্যটির প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, এই শক্তিধর ও ক্ষমতাধর সত্তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের আদ্যোপান্ত সকল কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

**শিক্ষা :** ১। নিকৃষ্ট, নাপাক শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্ট মানুষ ঝগড়াটে হয়ে আল্লাহর নিকট প্রশ্নকারী হয়ে দাঁড়ায়।

২। তাদেরকে জানিয়ে দাও, যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন।

৩। তিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন জ্বালাতে শিখিয়েছেন। তিনি কোনো কিছুর সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।

৪। বিশ্বজগতের সকল কিছুর রাজত্ব তাঁর হাতে এবং তাঁরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

**বাস্তবায়ন :** আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অতি নিকৃষ্ট, শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করে ঘোষণা দিয়েছেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - আমরা মানুষকে অতি উৎকৃষ্ট গঠনে গঠিত করে সৃষ্টি করেছি? তিনি আরও ঘোষণা দিয়েছেন "সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে।"

এমন মানুষ কিভাবে আল্লাহর নাফরমান বান্দা হয়ে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে অস্বীকার করতে পারে?

বিশ্বজগতের রাজত্ব যাঁর হাতে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে আমাদের কৃত সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। তাই আসুন আমরা এ মৌলিক কথাগুলো সমাজের অন্যান্য ভাইদেরকে জানিয়ে দিয়ে ইসলামী সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাই। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমীন। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

## দারস : ১৩

# আল কুরআনের আংশিক বিশ্বাসের পরিণতি

### ২. সূরা আল বাকারা

**মদীনায় নাযিল : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০**

**আলোচ্য আয়াত : ৮৫, ৮৬।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٨٥) اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. (٨٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৮৫) "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশের সাথে কুফরি করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে পার্থিব জীবনে তাদের দুর্গতি ছাড়া কোনো পথ নেই এবং কিয়ামতের দিন কঠোরতর শাস্তির দিকে তাদের নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর নন। (৮৬) এরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

**শব্দার্থ :** اَفَتُؤْمِنُوْنَ - তোমরা তবে কি বিশ্বাস করো? بِبَعْضٍ - কিছু

অংশ, الْكِتٰبِ - কিতাবের, وَتَكْفُرُوْنَ - এবং তোমরা অবিশ্বাস করো, ذٰلِكَ - তবে কি, جَزَاءُ - প্রতিদিন। مَنْ - যে, يَفْعَلُ - করবে, فَمَا - এরূপ, مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে, اِلاَّ - এছাড়া যে, خِزْىٌ - অপমান, লাঞ্ছনা, الْحَيٰوةِ - জীবনে, الدُّنْيَا - দুনিয়ার, وَيَوْمَ - এবং দিনে, الْقِيٰمَةِ - কিয়ামতের, يُرَدُّوْنَ - তারা নিক্ষিপ্ত হবে, اَشَدِّ - কঠোর, الْعَذَابِ - আযাবের, وَ - এবং, مَا - না, اَللّٰهُ - আল্লাহ, بِغَافِلٍ - বেখবর, عَمَّا - এ বিষয়ে যা, تَعْمَلُوْنَ - তোমরা করছো, اُولٰئِكَ - ঐসব (লোক), اَلَّذِيْنَ - যারা, اشْتَرَوُا - কিনে নিয়েছে, الْحَيٰوةَ - জীবনকে, الدُّنْيَا - দুনিয়ার, بِالْاٰخِرَةِ - আখেরাতের বিনিময়ে, فَلاَ - ফলে না, يُخَفَّفُ - হালকা করা হবে, عَنْهُمْ - তাদের থেকে, اَلْعَذَابُ - আযাব, وَ - এবং, لاَ - না, هُمْ - তারা, يُنْصَرُوْنَ - সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

**নামকরণ :** এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লিখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামতস্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আল বাকারা সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই।

**নাযিলের সময় :** হিজরতের আগে এবং পরে বিভিন্ন সময়ে এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে যে আয়াত কয়টি নাযিল হয়, তাও এ সূরায় শামিল করে দেয়া হয়েছে। অথচ তা নবী করীমের (সা)

জীবনের একেবারে শেষ অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার উপসংহারে হিজরতের পূর্বে মক্কা নগরীতে নাযিলকৃত কয়েকটি আয়াত, বিষয়বস্তুর সদৃশ ও সামঞ্জস্যের দরুন এ সূরার সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে না নিলে এ সূরাকে সহজে বুঝা সম্ভব হবে না।

(১) হিজরতের পূর্বে ইসলামী দাওয়াতের কথা সাধারণত মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাদের নিকট ইসলামের এই বাণী ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। হিজরতের পর ইসলামের দাওয়াত ইহুদীদের সম্মুখীন হলো। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী হয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ওহী ও ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিলো। বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তাওরাতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার সাথে মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। তারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো প্রকার সংস্কার সংশোধন নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হতো তবে তারা তাঁকে দুশমন মনে করে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত সহস্র বছর ধরে এই একই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে।

দীন বহির্ভূত বিষয়গুলো দীনের মধ্যে শামিল, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহ্কে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। মুসলিম নাম ভুলে গিয়ে নিছক ইহুদী নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ধরে রেখেছিল। ১৫ ও ১৬ রুকূতে ইহুদীদের সমালোচনা করে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পেশ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

(২) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের একটি নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতির প্রচার এবং দীন গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিলো।

হিজরতের পর মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ জারী করতে থাকেন। ইসলামের ভিত্তির উপর নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পন্থাও বলে দিলেন।

(৩) হিজরতের পূর্বে কাফেরদের ঘরেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছিল। যেসব লোক দাওয়াত গ্রহণ করছিল, তারা নিজ নিজ স্থান থেকেই দাওয়াতী কাজ করতো এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম-পীড়ন ভোগ করতো। কিন্তু হিজরতের পর বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণ যখন একত্র হয়ে ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, তখন একদিকে এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সমগ্র আরবদেশ একত্র হয়ে তার ধ্বংসের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। তখন এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাবিশিষ্ট দলের সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করতে লাগলো প্রধানত পাঁচটি কাজের উপর।

এক– পূর্ণ শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ইসলামের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই– বিরোধীরা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, বিষয়টি তাদের এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোনো বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

তিন– তারা আশ্রয়হীন, প্রবাসী ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার দরুন দারিদ্র্য, উপবাস এবং সর্বদা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অস্বস্তিকর অবস্থার শিকার হয়েও হতাশ না হয়ে পূর্ণ ধৈর্যসহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করে এবং তাদের সংকল্পে কোনোরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে দেয় না।

চার– ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে কোনো দিক থেকে সশস্ত্র আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের

সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বিরোধী পক্ষের জনসংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

পাঁচ– ঈমানদারদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সাহস ও হিম্মত জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে আরববাসীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে আপোসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলী ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

আলোচ্য সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা এই পাঁচটি কাজের প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে মুনাফিকের দল আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। নবী করীম (সা)-এর মক্কী জিন্দেগীর শেষের দিকে মুনাফিকির প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) মক্কার মুনাফিকের স্বরূপ ছিলো এমন– তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু ইসলামের খাতিরে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিলো না। মদীনায় আসার পর আরও অনেক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী মুনাফিক দল ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দলে প্রবেশ করতো।

(খ) দ্বিতীয় মুনাফিক দলের অবস্থা এই ছিলো যে, ইসলামী কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের অংশ ভোগ করতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও রক্ষা পেতো।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিলো। তাদের বংশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তারাও বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করতো,

কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করে ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাদের মন চাইতো না।

মহান আল্লাহ্ এই সূরায় তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী কালে তাদের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

**ব্যাখ্যা :** (ক) اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ -

"তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশকে বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে করো অবিশ্বাস?"

হিজরতের পূর্বে মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আউস ও খাযরাজ দু'টি আরব গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। বহিরাগত বনি নজীর, বনি কুরাইযা ও বনি কাইনুকা নামের ইহূদী গোত্রগুলো লক্ষ্য করলো যে, আউস ও খাযরাজ পূর্ব থেকেই বংশানুক্রমে একে অন্যের সাথে শত্রুতায় নিয়োজিত। তাই বহিরাগত ইহূদীগণ পৃথকভাবে পরামর্শ করলো যে "আমাদের এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হলে আউস ও খাযরাজকে পরামর্শ দিয়ে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে শত্রুতা আরও চরম আকার ধারণ করে।" তারা এক হয়ে গেলে আমাদের এ দেশে বসবাস করা সম্ভব হবে না। তাই ইহূদীগণ দু'ভাগ হয়ে একদল আউস বংশের সাথে সন্ধি করে, অপর দল খাযরাজ বংশের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়।

তাই একটি আরব গোত্র অপর কোনো গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিবদ্ধ ইহূদী গোত্রগুলো নিজেদেরকে বাঁচিয়ে কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করতো। মূলতঃ এরূপ কাজ খোদার নির্দেশের বিপরীত ছিলো। আর তারা ইচ্ছা করেই এরূপ করতো। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরাজিত দল ফিদিয়া বা বিনিময় দিয়ে বিজিতদের নিকট থেকে বন্দীদের ছাড়িয়ে নিত। আর এ বিনিময় কার্যকে সঙ্গত ও জায়েয প্রমাণ করার জন্য তারা খোদার কিতাব থেকে যুক্তি প্রদর্শন করতো। যুদ্ধ বন্দীদের বিনিময় নিয়ে খোদার কিতাবের অনুমতিকে তারা শিরোধার্য করে নিত বটে; কিন্তু পরস্পরে যুদ্ধ

সম্পর্কে খোদার কিতাব যে সুস্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছে, তাকে তারা মোটেই গ্রাহ্য করতো না।

(খ) فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যাদের এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা মোটেই অজ্ঞাত নন।"

খোদার কিতাবের কিছু অংশ মান্য ও অপর কিছু অংশ অমান্য করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও তাদের শান্তি ও মর্যাদা থাকবে না। দুনিয়ার জীবনে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং আখেরাতে তারা কঠোর আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

তোমরা যা কিছু করছ সে বিষয়ে আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন।

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ بَّصِيْرٌ. - আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

(গ) اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ.

"প্রকৃতপক্ষে এসব লোকেরাই নিজেদের পরকাল বিক্রি করে দুনিয়ার জীবন খরিদ করে নিয়েছে। কাজেই এদের প্রতি বরাদ্দ করা শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং কোনো সাহায্যও তারা পাবে না।"

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তাই দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি কাজকে পরকালের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. (١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى.

“কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ আখেরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।” (সূরা আল আ'লা : ১৬-১৭ আয়াত)

যারা আখেরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার জীবনকে নিয়েই পুরোপুরি ব্যস্ত থাকে, তারাই আখেরাতকে বিক্রি করে দুনিয়াকে খরিদ করে নিয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অধিক অসন্তুষ্ট। তাই তাদের প্রতি বরাদ্দ করা শাস্তি কিছু মাত্র কমানো হবে না। তাদের জন্য কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্যকারী এগিয়ে আসাতো দূরের কথা, খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

**শিক্ষা :** ১। আল কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস করা আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্বাস করলে পুরোটাই বিশ্বাস করতে হবে, এটাই ঈমান।

২। আল কুরআনের আংশিক বিশ্বাস কুফরির শামিল, সেটা ঈমান হয় না।

৩। যারা আল কুরআনকে আংশিক বিশ্বাস করে তারা পরকালের বিনিময়ে শুধু দুনিয়ার জীবনকেই খরিদ করে নেয়। তাদের জন্য বরাদ্দ করা শাস্তি লাঘব করা হবে না। আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।

**বাস্তবায়ন :** মুসলমানদের মধ্যে আল কুরআন পড়তে জানা লোকের সংখ্যা কেবল কম নয়। কিন্তু তারা কেবল তেলাওয়াতই করতে জানে, অর্থ বুঝে পড়তে জানে না। আর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা আল কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করে। আর কর্মক্ষেত্রে স্বার্থের প্রতিকূল হলে বিশ্বাসের কার্যকারিতা থাকে না।

তাই আমরা আল কুরআনের সমাজ গড়ার জন্য আমাদের মুসলিম সমাজে অর্থসহ, শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করবো। আল কুরআন অবিশ্বাসের পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে বুঝাবো। কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সকলকে বলবো। এ কাজের তাওফীক কামনা করছি। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা-বিল্লাহ।

## দারস : ১৪

# আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন ও ত্বরিত শাস্তি বানরে পরিণত হওয়া

## ০৭. সূরা আল আ'রাফ

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-২০৬, রুকূ-২৪**

**আলোচ্য আয়াত : ১৬৩-১৬৬।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٦٣) وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ م اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لاَ يَسْبِتُوْنَ لا لاَ تَأْتِيْهِمْ ج كَذٰلِكَ ج نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. (١٦٤) وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ لا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ. (١٦٥) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ م بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. (١٦٦) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১৬৩) "সমুদ্রের তীরে যে

জনপদটি অবস্থিত ছিলো তার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। তাদের সে ঘটনার কথা স্মরণ করে দাও যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো, অথচ শনিবার ব্যতীত অন্যদিন আসতো না। তাদের নাফরমানির কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম বলেই এমনটি হতো। (১৬৪) আর তাদের এ কথাও স্মরণ করে দাও, যখন তাদের একটি দল অন্য দলকে বলেছিল; "তোমরা এমন লোকদের উপদেশ দিচ্ছো কেন যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন?" জবাবে তারা বলেছিল, "এসব কিছু এজন্যই করছি যেন আমরা তোমাদের রবের সামনে নিজেদের ওজর পেশ করতে পারি এবং এ আশায় করছি যে, হয়তো এ লোকেরা তাঁর নাফরমানি করা ছেড়ে দেবে।" (১৬৫) শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যে সমস্ত হেদায়াত স্মরণ করে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গেলো, তখন যারা খারাপ কাজে বাধা দিতো তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম এবং বাকী সমস্ত লোক যারা দোষী ছিলো তাদের নাফরমানীর জন্য তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলাম। (১৬৬) তারপর তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) যে কাজ থেকে বাধা দেয়া হয়েছিল, তাই যখন তারা ঔদ্ধত্যসহ করে যেতে লাগলো তখন আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।"

**শব্দার্থ :** اَسْئَلْهُمْ - তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, اَلْقَرْيَةَ - জনপদ, الَّتِىْ - যা, كَانَتْ - ছিলো, حَاضِرَةَ - অবস্থিত, اَلْبَحْرِ - সমুদ্র (তীরে), يَعْدُوْنَ - তারা সীমা লঙ্ঘন করতো, فِىْ - ব্যাপারে, السَّبْتِ - শনিবারে, تَاْتِيْهِمْ - তাদের কাছে আসতো, حِيْتَانُهُمْ - তাদের মাছগুলো, شُرَّعًا - প্রকাশ্যে উপরিভাগে, يَسْبِتُوْنَ - সাপ্তাহিক ইবাদত করতো, لاَتَاْتِيْهِمْ - তাদের কাছে আসতো না, كَذٰلِكَ - এভাবে, نَبْلُوْهُمْ - আমরা তাদের পরীক্ষা করি, بِمَا - এ কারণে, كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ – তারা নাফরমানি করেছিল, قَالَتْ - বলেছিল, اُمَّةٌ - একদল, مِنْهُمْ - তাদের মধ্য থেকে, لِمَ - কেন, تَعِظُوْنَ - তোমরা সদুপদেশ দাও, قَوْمًا -

লোকদেরকে, مُهْلِكُهُمْ - যাদেরকে ধ্বংস করবেন, مُعَذِّبُهُمْ - তাদের শাস্তি দিবেন, شَدِيْدًا - কঠোর, مَعْذِرَةً - ওজর পেশ, لَعَلَّهُمْ - তারা যাতে, يَتَّقُوْنَ - সংযত হয়, فَلَمَّا - অতঃপর যখন, نَسُوْا - তারা ভুলে গেলো, ذُكِّرُوْا - তাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছিল, يَنْهَوْنَ - বিরত হয়েছিল, السُّوْءَ - মন্দ, اَخَذْنَا - আমরা ধরলাম, ظَلَمُوْا - যুলুম করেছিল, بَئِيْسٍ - ভয়ানক, نُهُوْا - নিষেধ করা হয়েছিল, قُلْنَا - আমরা বললাম, لَهُمْ - তাদেরকে, كُوْنُوْا - তোমরা হও, قِرَدَةً - বানর, خٰسِئِيْنَ - লাঞ্ছিত-অপমানিত।

**নামকরণ :** এ সূরার পঞ্চম রুকুর ৪৬ ও ৪৭ নং আয়াতে 'আসহাবুল আ'রাফ' বা আ'রাফবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 'আল আ'রাফ'।

**নাযিলের সময়কাল :** এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যেন, এ সূরা মাক্কী জীবনের শেষ দিকে সূরায়ে আল আন'আমের সমসাময়িক কালের সূরা। এ সূরা দু'টির কোন্টি আগে আর কোন্টি পরে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

**শানে নুযূল :** এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়কাল জানার পর অতি সহজেই আমরা এর নাযিলের উপলক্ষ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে করতে আল্লাহর রাসূলের বারটি বছর অতীত হয়েছে। কুরাইশদের শত্রুতা চরম আকার ধারণ করেছে। এক বিরাট সংখ্যক ইসলাম গ্রহণকারী লোক হাব্শায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। নবী করিম (সা)-এর সাহায্য সহযোগিতার জন্য আর আবু তালিব ও খাদিজাতুল কুবরা জীবিত নেই। সকল বৈষয়িক আশ্রয় নির্ভর হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলামের প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর প্রচারের ফলে মক্কা ও এর আশ-পাশের গোত্রসমূহের বহুসত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করছিলেন। গোটা আরবজাতি সামগ্রিকভাবে এটা প্রত্যাহার ও অস্বীকার করে চললো। কোনো ব্যক্তির ইসলামের দিকে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ পেলে তাকে বিদ্রূপ, তিরস্কার, দৈহিক নির্যাতন, সামাজিক বয়কট, সম্পর্কছেদ প্রভৃতির আঘাতে জর্জরিত হতে হতো। এ

অন্ধকার পরিবেশে কেবলমাত্র মদীনার দিক থেকে এক অস্পষ্ট আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা নবী করিম (সা)- এর নিকট ইসলাম কবুল করেছিল এবং কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। এ সামান্য ও সংকীর্ণ সূচনায় ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের বুঝার ক্ষমতা ছিলো না। বাহ্যিকভাবে লোকেরা দেখতো সে ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলনমাত্র। এর পেছনে বড় কোনো শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা নেই। ইসলামের নেতা নিজ বংশের দুর্বল ও অসহায় কয়েকজন লোকের সমাবেশ ছাড়া অন্য বড় কোনো শক্তির অধিকারী নন। অল্প কয়েকজন বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের জাতীয় বিশ্বাস ও আদর্শ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র, কিন্তু এর ফলে তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়েছে। যেমন পত্র পল্লব বৃন্তচ্যুত হয়ে গাছ থেকে ঝরে মাটিতে লুটে পড়ে।

**মূল আলোচ্য বিষয় :** এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণের প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করা। এ আহ্বানে ভয় প্রদর্শনের ধরনটা খুবই সুস্পষ্ট। কেননা যাদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, তারা মক্কার অধিবাসী। এক দীর্ঘকাল ধরেই তাদেরকে নানাভাবে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তার প্রতি তাদের অমনোযোগিতা, জিদ, হঠকারিতা ও বিরোধিতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে ছিলো সে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য লোকদের প্রতি লক্ষ্য করার জন্য নবী (সা) প্রতি নির্দেশ আসার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। দাওয়াত কবুল করার আহ্বানের সাথে সাথে তাদেরকে এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, আজ তোমরা নবীর সাথে যে ধরনের ব্যবহার করছো, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তৎকালীন নবী রাসূলদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে তারা অত্যন্ত খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল।

ভাষণের শেষভাগে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে আহলে কিতাব, সারা দুনিয়ার মানুষ ও ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সাথে মুনাফিকী নীতি, আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং মিথ্যার

প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা দানের কাজে আপাদমস্তক ডুবে থাকার পরিণাম কি, তাও এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষের দিকে ইসলাম প্রচারের কৌশল সম্পর্কে ঈমানদারগণকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিরোধীদের উত্তেজনা, উৎপীড়ন ও দমনমূলক কার্যকলাপের মোকাবেলায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন এবং আবেগ উত্তেজনার বশে মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لا لَاتَأْتِيْهِمْ ج كَذٰلِكَ ج نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

(১৬৩) "আর সমুদ্রের তীরে যে জনপদটি অবস্থিত ছিলো তার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো। তাদের সে ঘটনার কথা স্মরণ করে দাও সেখানকার লোকেরা শনিবারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো। অথচ শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসতো না। তাদের নাফরমানির কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম বলেই এমনটি হতো।"

বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে এ স্থানটি ছিলো 'আয়লা' বা 'আয়লাত' যেখানে বর্তমান ইসরাঈলের ইহুদী রাষ্ট্র এ নামে একটি বন্দর নির্মাণ করেছে। এ স্থানের নিকটেই জর্দানের বিখ্যাত বন্দর 'আকাবা' অবস্থিত। বনী ইসরাঈলের যুগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিলো। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এ শহরকেই হযরত সুলায়মান (আ) সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহরের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

বনী ইসরাঈলীদের জন্য শনিবারকে পবিত্র দিন গণ্য করা হতো। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ শনিবারে পার্থিব কোনো কাজ করা নিষিদ্ধ ছিলো। যে ব্যক্তি এ নিয়ম লঙ্ঘন করবে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু বনী

ইসরাঈল প্রকাশ্যে এ আইনের বিরোধিতা করতে থাকে। ইয়ারমিয়াহ নবীর আমলে লোকেরা খাস জেরুসালেমের সিংহ দরজাগুলো দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলাফেরা করতো। এতে ঐ নবী ইহুদীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তোমরা যদি এভাবে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে জেরুসালেমে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। (যিরসির-১৭ : ২১-২৭)। শনিবারের অবমাননাকে নিয়ে ইহুদীদের আরো অনেক ঘটনা আছে। এসব উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে, কুরআন মাজীদ এখানে যে ঘটনাটির কথা বলছে সেটিও সম্ভবত সে সময়ের ঘটনা।

মহান আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেন তার মধ্যে এটাও একটা যে, যখন কোনো দলের মধ্যে আনুগত্যহীনতা ও নাফরমানির প্রবণতা বেড়ে যায়, তখন তাদের আরও বেশি নাফরমানির সুযোগ দেয়া হয় আর ভেতরে নাফরমানির যেসব প্রবণতা লুকিয়ে থাকে সেসব পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যেসব অপরাধে সে নিজেকে কলুষিত করতে চায় কেবলমাত্র সুযোগের অভাবে সে সেগুলো থেকে বিরত থেকে না যায়।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ لا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

(১৬৪-১৬৫) "তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করে দাও যে, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিল : "তোমরা এমন লোকদের কেন নসিহত করো যাদেরকে আল্লাহ্ই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন?" তারা জবাব দিলো : "আমরা এসব তোমাদের রবের দরবারে নিজেদের ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি, এ আশায় করছি যে, হয়তো বা এ লোকেরা তাঁর নাফরমানি থেকে বিরত থাকবে।" শেষ পর্যন্ত তারা যখন সে হেদায়াত সম্পূর্ণ ভুলে গেল যা তাদেরকে স্মরণ করে দেয়া হয়েছিল, তখন আমরা সে লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম, যারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতো, আর

বাকী লোকগুলোকে– যারা যালেম ছিলো- তাদেরই নাফরমানির কারণে কঠিন আযাবে পাকড়াও করলাম।”

এখানকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ জনপদে তিন প্রকারের লোক বর্তমান ছিলো। প্রথমত, যারা অনবরত ও অবাধে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে চলছিল। দ্বিতীয়ত, যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিল না কিন্তু অমান্য করাকে নীরবে বসে দেখছিল, নিজেরা বাধা দিত না। আর যারা বাধা বা উপদেশ দিত তাদেরকে বলতো– এ হতভাগাদের নসিহত করে লাভ কি? তৃতীয়ত, যারা ঈমানের বলে বলিয়ান, আল্লাহর সীমালঙ্ঘন ও অমর্যাদাকে সহ্য করতে পারছিল না, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে তৎপর ছিলো। তারা মনে করতো যে তাদের উপদেশের ফলে অসৎ লোকেরা সৎপথে আসতে পারে; আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তবুও আমরাতো আমাদের চেষ্টার জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে পারবো।

এ অবস্থায় যখন এ অঞ্চলে আল্লাহর গযব নেমে আসলো, পবিত্র কুরআনের ঘোষণা : وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً.

“সে বিপর্যয় থেকে সাবধান হও, যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা যুলুম করেছে তারাই পড়বে না।” এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী (সা) বলেছেন : “মহান আল্লাহ্ বিশেষ লোকদের অপরাধের কারণে সাধারণ লোকদের শাস্তি দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ লোক নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে, কিন্তু বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা বা অসন্তোষ প্রকাশ করে না। লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ্ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।”

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, এ জনপদের উপর দুই পর্যায়ে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয় عَذَابٌ بَئِيْسٌ (কঠিন শাস্তি) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নাফরমানি যারা অব্যাহত রেখেছিল তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

(১৬৬) "অতপর যে কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছিল তাই যখন তারা পূর্ণ ঔদ্ধত্যসহ করে যেতে লাগলো তখন আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।"

তাদেরকে বানরে পরিণত করার ধরন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, তাদের দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন করে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, তাদের মধ্যে বানরের স্বভাব ও গুণাবলি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকে মনে হয় যে, তাদের মধ্যে নৈতিক নয়, বরং দৈহিক বিকৃতি ঘটেছিল।

**শিক্ষা :** ১। মানব সমাজে তিন প্রকারের মানুষ দেখা যায়।

ক. যারা অনবরত ও অবাধে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে চলছে।

খ. যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করছে না, কিন্তু অমান্য করাকে নীরবে বসে দেখছে, নিজেরা বাধা দেয় না। আর বাধা দানকারীদের বলে- এদের নসিহত করে লাভ কি?

গ. যারা ঈমানের বলে বলিয়ান, আল্লাহর সীমালঙ্ঘন ও অমর্যাদাকে সহ্য করতে পারে না, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে তৎপর আছে।

২। সাধারণ লোক যখন নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে; কিন্তু বাধা দেয়ার ক্ষমতা সত্ত্বেও বাধা দেয় না বা অসন্তোষ প্রকাশ করে না এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।

৩। সুতরাং মানব সমাজের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা প্রয়োজন, যারা সৎকাজের আদেশ (তা'মুরূনা বিল মা'রূফ) ও অসৎ কাজে নিষেধের (নাহি আনিল মুনকার) দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।

**বাস্তবায়ন :** উল্লিখিত শিক্ষার আলোকে আমরা সকলে যেন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে চলে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করে শান্তির সমাজ গড়ে তুলতে পারি, আল্লাহ তা'আলার নিকট এই তাওফীক কামনা করছি। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।

## দারস : ১৫

# কিয়ামতের চিত্র, পাল্লা হালকা এবং ভারী হওয়ার পরিণাম

## ১০১. সূরা আল কারিয়াহ

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-১১, রুকূ-১**

**আলোচ্য আয়াত : পূর্ণ সূরা।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ لا مَا الْقَارِعَةُ ج وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ط يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ لا وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ط فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ لا فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ط وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ط نَارٌ حَامِيَةٌ ع

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) "মহাদুর্ঘটনা, কি সে মহাদুর্ঘটনা? তুমি কি জানো সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি? সেদিন লোকেরা ছিন্নভিন্ন পতঙ্গের মত এবং পাহাড়গুলো ধুনাতুলারাশির মত হবে। অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে পছন্দমত সুখে থাকবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। তুমি কি জানো তা কি? (তা) জ্বলন্ত আগুন।"

**শব্দার্থ :** اَلْقَارِعَةُ - ভয়াবহ দুর্ঘটনা, اَدْرٰكَ - তোমাকে জানাবে, يَوْمَ - সেদিন, يَكُوْنُ - হবে, النَّاسُ - মানুষ, كَالْفَرَاشِ - পতঙ্গের মতো,

- كَالْعِهْنِ - পাহাড়সমূহ, اَلْجِبَالُ - হবে, تَكُوْنُ - বিক্ষিপ্ত, اَلْمَبْثُوْثِ
পশমের মত, اَلْمَنْفُوْشِ - ধুনা, فَاَمَّا - অতঃপর তার, ثَقُلَتْ - ভারী
হবে, مَوَازِيْنُهُ - তার (নেকীর) পাল্লাসমূহ, فَهُوَ - সে অতঃপর, عِيْشَةٍ
- জীবনের, رَّاضِيَةٍ - সন্তোষপূর্ণ, خَفَّتْ - হালকা হবে, فَاُمُّهُ - অতঃপর
তার আশ্রয়স্থল, هَاوِيَةٌ - গভীর গহ্বর হবে, اَدْرٰكَ - তোমাকে জানাবে,
مَاهِيَهْ - সেটা কি, نَارٌ - আগুন, حَامِيَةٌ - জ্বলন্ত।

**নামকরণ :** এ সূরার প্রথম শব্দ القارعة। কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। القارعة। শব্দের অর্থ ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আসলে এ কেবল নামই নয়, এর বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যের শিরোনামও তাই। কারণ এ সূরার মধ্যে শুধু কিয়ামতের বর্ণনাই দেয়া হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল :** এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায়, এ সূরা মক্কার প্রাথমিককালে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম।

**বিষয়বস্তুর আলোচনা :** এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য হলো 'কিয়ামত ও পরকাল'। সর্বপ্রথম বিরাট দুর্ঘটনা বলে লোকদেরকে আতঙ্কিত করে কাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। তার পর দু'টো বাক্যে কিয়ামতের অবস্থা পেশ করা হয়েছে। (১) সেদিন মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আলোর চারিদিকে ছিন্নভিন্ন পতঙ্গের মতো ছুটাছুটি করতে থাকবে। (২) পাহাড়গুলো মাটির বাঁধন ছিন্ন করে ধুনা পশমের মতো নিজের স্থান হতে বয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন মানুষের বিচারের জন্য যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে তখন কোনো লোকের নেকআমল বদআমলের তুলনায় ভারী হবে এবং কারো হালকা হবে– তা হবে ফয়সালার মাপকাঠি। ভারীপাল্লা বিশিষ্ট লোকেরা আরামের ও সুখের জীবন লাভ করে ধন্য হবে, আর হালকাপাল্লা বিশিষ্ট লোকেরা আগুনে ভর্তি গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।

**ব্যাখ্যা :** (ক) اَلْقَارِعَةُ - "মহাপ্রলয়", কুরআনের মূলশব্দ হচ্ছে "কারিআ" قَارِعَةٌ এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে, "যে ঠোকে।" কারা'আ অর্থ

কোনো জিনিসের উপর কোনো জিনিসকে এমন জোরে নিক্ষেপ করা যার ফলে ঐ জিনিস থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। এ শব্দের অর্থের সাথে মিল রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বড় রকমের মারাত্মক বিপদের স্থলে 'কারিআ' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবরা বলে, قَرَعَتْهُمُ الْقَارِعَةُ অর্থাৎ উমুক উমুক পরিবার ও গোত্রের লোকদের উপর ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে। কোনো জাতির উপর বড় ধরনের বিপদ নাযিল হবার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের এক জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা রা'দে বলা হয়েছে- "وَلَايَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ" - "যারা কুফরি করেছে তাদের উপর তাদের কর্মের কারণে কোনো না কোনো বিপদ নাযিল হতে থাকে।" (৩১ আয়াত) এখানে কিন্তু "আল কারিআ" শব্দটি কিয়ামতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আল হা-ক্কায় কিয়ামতকে এ শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত করা হয়েছে (আয়াত ৪)। এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে এখানে পুরো আখেরাতের আলোচনা একসাথে করা হচ্ছে।

(খ) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ. (٤) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ. (٥)

"সেদিন লোকেরা যখন ছিন্নভিন্ন পতঙ্গের মতো ছুটাছুটি করতে থাকবে এবং পাহাড়গুলো রঙবেরঙের ধুনা পশমের মতো উড়ে যাবে।"

কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা এখনো চলছে। যখন মহাদুর্ঘটনা ঘটে যাবে, যার কারণে সমস্ত জগতের ব্যবস্থাপনা এলোমেলো হয়ে যাবে। লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে যেমন আলোর নিকট পতঙ্গরাজি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছুটাছুটি করতে থাকে। পাহাড়গুলো মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রংবেরং-এর ধুনা পশমের মতো উড়তে থাকবে।

(গ) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ. (٦) فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. (٧) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ. (٨) فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ.(٨)

"তারপর যার পাল্লা ভারী হবে সে মনের মতো সুখীজীবন লাভ করবে আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর হবে তার ঠিকানা।"

"কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বলা হচ্ছে যে, কবর হতে পুনরায় জীবিত হয়ে লোকেরা আল্লাহর আদালতে হাজির হতে থাকবে।

এখানে মাওয়াযীন (مَوَازِيْنُ) ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি মাওযূন مَوْزُوْنٌ -এর বহুবচন হতে পারে। আবার মীযান (مِيْزَانٌ) এর বহুবচনও হতে পারে। যদি এটি মাওযূনের বহুবচন হয় তাহলে মাওয়াযীন অর্থ হবে আল্লাহর নিকট যার ওজন আছে এবং আল্লাহর আদালতে যে মর্যাদা লাভের যোগ্যতা রাখে। আর যদি একে মীযানের বহুবচন গণ্য করা হয় তাহলে মাওয়াযীন অর্থ হবে দাঁড়িপাল্লার পাল্লা। প্রথম অবস্থায় মাওয়াযীনের ভারী বা হালকা হবার মানে হবে অসৎ কর্মের মোকাবেলায় সৎ কর্মের ভারী ও হালকা হওয়া। আল্লাহ তা'আলার নিকট শুধুমাত্র নেক আমলেরই ওজন আছে এবং মূল্যবান। দ্বিতীয় অবস্থায় মাওয়াযীনের ওজন হবার অর্থ হয় আল্লাহর নিকট নেকীরপাল্লা পাপেরপাল্লার চেয়ে বেশী ভারী হওয়া। আর পাল্লা হালকা হবার অর্থ হয় নেকীরপাল্লা পাপেরপাল্লার তুলনায় অধিক হালকা হওয়া। মীযান অর্থ পাল্লা। আবার মীযান অর্থ ওজনও হয়। ওজনে ভারী ও হালকা হবার মানে হয়, নেকীর ওজন ভারী ও হালকা হওয়া। মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে হাজির হবে তা ভারী না হালকা, মানুষের নেকী তার পাপের চেয়ে ওজনে বেশী না কম তারই ভিত্তিতে সেখানে ফয়সালা হবে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। সূরা আরাফে বলা হয়েছে ঃ "ওজন হবে সেদিন সত্য। তারপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কৃতকার্য হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" (৮, ৯ আয়াত) সূরায়ে কাহাফে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী, এ লোকদেরকে বলে দাও, আমি কি তোমাদের জানাবো নিজেদের আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ কারা? তারাই ব্যর্থ যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড সত্য সঠিক পথ থেকে

বিচ্যুত থেকেছে এবং যারা মনে করছে, তারা সবকিছুই ঠিক করে যাচ্ছে। এ লোকেরাই তাদের রবের আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সম্মুখে হাজির হওয়ার বিষয়টি তারা বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো আমল ওজন করবো না।" (১০৪, ১০৫ আয়াত) সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ "কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা রেখে দেবো। অতঃপর কারো উপর অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। যার সরিষার দানা পরিমাণ আমল থাকবে তাও আমি সামনে উপস্থিত করবো, এর হিসাব করার জন্য আমিই যথেষ্ট।" (৪৭ আয়াত) এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়, কুফরি করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা গুনায়ে কবীরার অন্তর্ভুক্ত। গুনাহেরপাল্লা তাতে অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায়। নেকীরপাল্লায় ওজন হওয়ার মতো কাফেরদের কোনো নেকী থাকবে না। মুমিনের নেকীর ওজনের সাথে সাথে ঈমানেরও ওজন হবে। এক পাল্লায়  নেক ও অপর পাল্লায় গুনাহ উঠিয়ে দিয়ে দেখা হবে কোন পাল্লা ঝুঁকে আছে?

(ঘ) (১১) نَارٌ حَامِيَةٌ. (١٠) وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ. "তুমি কি জানো তা কি? জ্বলন্ত আগুন।"

أُمُّهُ هَاوِيَةٌ - "হাবিয়া হবে তার মা"। হাবিয়া (هَاوِيَةٌ) শব্দটি হাওয়া (هَاوِى) থেকে এসেছে। গভীর গর্তে কোনো জিনিস পড়ে যাওয়াকে হাবিয়া বলে। এ জাহান্নামটি সকল জাহান্নামের চেয়ে অধিক গভীর হবে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে হাবিয়া। হাবিয়া দোযখে একটি পাথরের টুকরো ছেড়ে দিলে এটা হাবিয়ার তলায় পড়তে চল্লিশ বছর বা তার কাছাকাছি সময় লাগবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। সেই জাহান্নামবাসীদেরকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। মা যেমন তার সন্তানকে আকৃষ্ট করে নিরাপদ কোলে স্থান দেয়, তেমনি হাবিয়া মায়ের মতো জাহান্নামীদেরকে কোলে স্থান করে দেবে। সে গভীর খাদটি প্রজ্বলিত আগুনে পরিপূর্ণ থাকবে।

**শিক্ষা :** ১। আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রলয় বলে কিয়ামতের ভয়াবহ মহাবিপদ মুসিবতের কথা জানিয়ে মানুষকে সাবধান করছেন।

২। সেদিন মানুষ ছিন্নভিন্ন পতঙ্গের মতো এবং পাহাড়গুলো ধুনা পশমের মতো বয়ে যাবে।

৩। সেদিন যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখীজীবন লাভ করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে গভীর জ্বলন্ত আগুনের গহ্বর হবে তার ঠিকানা।

**বাস্তবায়ন :** আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী মানব সমাজকে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে মানুষকে প্রেরণ করেছেন। এ প্রতিনিধির দায়িত্ব যারা পালন করে তারাই উত্তম উম্মত। আর এ শ্রেষ্ঠ উম্মতগণই মানুষকে নাফরমানির পথ থেকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করেন।

আসুন! আমরা আল্লাহর দেয়া এ নীতি অনুসরণ করে মানব সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে গভীর অগ্নি গহ্বর হাবিয়া থেকে আত্মরক্ষা করে সুখী জীবনের (জান্নাতুল ফেরদাউসের) উপযোগী শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত হই। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

# দারস : ১৬

## নিজেদের প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না

### ১৩. সূরা আর রা'দ

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-৪৩, রুকূ-৬**

**আলোচ্য আয়াত : ১১**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١١) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "তাঁর পক্ষ থেকে সামনে ও পেছনে প্রহরী রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে হেফাযত করে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে। আল্লাহ্‌ যখন কোনো জাতির অমঙ্গল করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তা ব্যর্থ হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন জাতির কোনো সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে না।"

**শব্দার্থ :** لَهٗ - তার জন্য, مُعَقِّبٰتٌ - প্রহীরারা, مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ - তার আগে, مِنْ خَلْفِهٖ - তার পিছে, يَحْفَظُوْنَهٗ - তাকে তারা রক্ষা করে, مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ - আল্লাহর নির্দেশে, لَايُغَيِّرُ - পরিবর্তন করেন না, مَا -

অবস্থা, بِقَوْمٍ - কোনো জাতির, حَتّٰى - যতক্ষণ না, مَا - অবস্থা, بِاَنْفُسِهِمْ - তাদের নিজেদের, اَرَادَ - ইচ্ছা, بِقَوْمٍ - কোনো জাতির সাথে, سُوْءًا - মন্দ, فَلَا - তখন নেই, مَرَدَّ - ফেরানোর, مَا -নেই, لَهُمْ - তাদের জন্য, مِنْ دُوْنِهٖ - তাঁর ছাড়া, وَّالٍ - অভিভাবক।

**নামকরণ :** এ সূরার ১৩ নং আয়াতের অংশ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ হতে اَلرَّعْدُ। শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। اَلرَّعْدُ -অর্থ মেঘের গর্জন। এ সূরার আলোচ্য বিষয় এটা নয়।

**নাযিলের সময় :** এ সূরার ২৭ থেকে ৩১ এবং ৩৮ থেকে ৪৩ নং আয়াতের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এ সূরা সূরায়ে আ'রাফ, ইউনুস ও হূদ নাযিলের দিক দিয়ে এরা সমসাময়িক। রাসূলে করীম (সা) অনেক বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে যতই ডেকেছেন, বিরোধীরা ততই তাকে অপমান করার চেষ্টা করেছে। সাহাবায়ে কিরাম নিরাশ হয়ে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাদেরকে হেদায়াত করার ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বুঝালেন যে, মানুষকে অলৌকিক ঘটনা দ্বারা হেদায়াত করার নীতি তিনি পছন্দ করেন না। মানুষ বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে ফয়সালা করুক যে, হেদায়াত কবুল করবে, নাকি গোমরাহ-ই থাকবে।

ইসলামের উপর হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্র এতদিন যাবৎ আল্লাহ তা'আলা সহ্য করেছেন বলে মুমিনদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার জবাবে বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের দুর্বল হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথা সন্দেহমুক্ত হয়ে গেছে যে, কবর থেকে মরা মানুষ উঠে এলেও এরা হেদায়াত কবুল করবে না; বরং এর কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা দেবে। বিরোধিতার এ পর্যায় থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মক্কী যুগের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয় :** সূরাটির মূলকথা প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা) যা পেশ করেছেন তা অতি সত্য হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না। এটা তাদের মস্ত বড় ভুল। গোটা সূরার এটাই কেন্দ্রীয় বিষয়।

তাওহীদ, রেসালাত এবং আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করে তাদের ভুল

ভাঙ্গানোর জন্য বার বার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলোকে বিশ্বাস করার উপকারিতা ও অবিশ্বাস করার ক্ষতি সম্পর্কে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত এবং আখেরাতের পক্ষে যুক্তি পরিবেশন করে একদিকে বিবেক বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করা এবং অপরদিকে এসবের প্রতি ঈমান আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এক একটি দলিল প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করার ফাঁকে ফাঁকে নানাভাবে ভয়ও দেখানো হয়েছে, আবার স্নেহের ভাষায় উপদেশও দেয়া হয়েছে। সূরাটির বিভিন্ন আয়াতে বিরোধীদের কয়েকটি আপত্তির কথা উল্লেখ না করেই জবাব দেয়া হয়েছে। জবাব থেকেই বুঝা যায় কোন্ আপত্তির জবাব কোন্টি।

এগার, বার বছর অবিরাম দীনের দাওয়াত দিতে দিতে মুমিনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং জনগণ দাওয়াত কবুল না করায় হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন বলে সূরাটিতে মুমিনগণকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** (ক) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ -

"প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে।"

আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় নিজেই সরাসরি দেখছেন এবং তার গতিবিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তদুপরি আল্লাহর মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে রয়েছেন এবং ব্যক্তির জীবনের সকল কার্যক্রম রেকর্ড ও সংরক্ষণ করে চলছেন। সূরা আল ইনফিতার-এর দশ, এগার ও বার নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ لا كِرَامًا كَاتِبِيْنَ لا يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

"তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানেন।"

এ সত্যকথাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে, এমন কল্পনাতীত

ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন থেকে যারা এ কথা মনে করে জীবন যাপন করে যে, তাদেরকে লাগামহীন উটের মতো দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তাই দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও আর ফূর্তি করো। তাদের কৃতকার্যের জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। এ সকল বেঈমানরা নিজেরাই নিজেদের তৈরি গর্তে নিপতিত হবে।

(খ) إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে।"

এখানে রয়েছে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ইসলামী শর্ত। এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটি জাতির ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবনধারা যেভাবে গড়ে তোলে, সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে সে ধারাই বিকশিত হয় অর্থাৎ কোনো জাতিকে যদি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে প্রথমে জাতির লোকদের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। আবার এটাও সত্য যে, চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধন না করে কারো চরিত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রকৃতি। মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া একমাত্র তাঁরই জানা।

মেহেরবান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত তাঁর জীবন দর্শন মানুষের সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদেরকে। নবী-রাসূলগণ প্রথমে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করতে চেয়েছেন। মানুষের চিন্তাজগতে ইসলামী জীবনদর্শনের বীজ বপন করার চেষ্টা করেছেন। যাদের চিন্তাজগৎ ইসলামী জীবন দর্শন ধারণ করেছে, তাদের কর্মজগতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

(গ) وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

"আল্লাহ যখন কোনো জাতির অমঙ্গল করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তা ব্যর্থ হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন জাতির কোনো সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে না।"

তোমরা এমন ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তোমরা যত অন্যায়-অত্যাচার কর না কেন, তোমাদের নিকট থেকে উৎকোচ বা নজরানা গ্রহণ করে পীর, ফকির, মহাপুরুষ অথবা কোনো জিন, ফেরেশতা তোমাদেরকে অন্যায় অসৎ কাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে। সমাজে এ জাতীয় ধারণা দেয়ার লোকের অভাব নেই। মুমিন ব্যক্তি এ জাতীয় ধোঁকায় পা দেবে না।

**শিক্ষা :** ১। বান্দার আগে ও পিছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত প্রহরী রয়েছে, যারা বান্দার হেফাযত ও সকল কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ করে চলছেন।

২। আল্লাহ্‌র তা'আলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করে।

৩। আল্লাহ্‌ তা'আলা কোনো জাতির অমঙ্গল করার সিদ্ধান্ত নিলে সে জাতিকে রক্ষা করার সাধ্য কারো নেই। কোন পীর, ফকির, দরবেশ তাকে রক্ষা করতে পারবে না যদি না আল্লাহ্‌ চান।

**বাস্তবায়ন :** মানব সমাজের লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন তাহলে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মাঝেই সকল সমস্যার সমাধান নিহিত।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ মানুষকে তার নিজের জন্য কিছু করার শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা, বুদ্ধিবিবেক ও অনুকূল পরিবেশ দান করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে সে তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তার সহায় হন। কোন জাতির জনগণ আন্তরিকভাবে তাদের অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করলে আল্লাহ্‌ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন। সমাজে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আদর্শও এমনি এমনি প্রতিষ্ঠিত হবে না। তার জন্যও মুসলিমদের চেষ্টা করতে হবে।

তাই আমরা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

## দারস : ১৭

# দ্বীনকে নেয়ামত হিসেবে পূর্ণতা দান

## ৫. সূরা আল মায়েদা

**মদীনায় নাযিল : আয়াত-১২০, রুকূ-১৬**

**আলোচ্য আয়াত : ৩।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٣) اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ لا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৩) "আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। (হালাল-হারামের যে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো) যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে কোনো নিষিদ্ধ জিনিস খেয়ে ফেলে গুনাহ্ করার কোনো প্রবণতা ছাড়াই, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গুনাহ্ মাফকারী ও অনুগ্রহকারী।"

**শব্দার্থ :** اَلْيَوْمَ - আজ, يَئِسَ - নিরাশ হয়েছে, كَفَرُوْا - কুফুরি করেছে, دِيْنِكُمْ - তোমাদের দ্বীন, فَلاَ - অতএব না, تَخْشَوْا - তোমরা ভয় করো,

هُمْ - তাদেরকে, اَخْشَوْنِ - আমাকে তোমরা ভয় করো, اَكْمَلْتُ - আমি পূর্ণাঙ্গ করলাম, لَكُمْ - তোমার জন্য, دِيْنَكُمْ - তোমাদের দ্বীনকে, اَتْمَمْتُ - আমি সম্পূর্ণ করলাম, عَلَيْكُمْ - তোমাদের উপর, نِعْمَتِيْ - আমার নেয়ামত, رَضِيْتُ - আমি পছন্দ করলাম, اَلْاِسْلَامَ - ইসলামকে, دِيْنًا - দ্বীন (হিসেবে), فَمَنِ - যে অতঃপর, اضْطُرَّ - বাধ্য হয় (খেতে), مَخْمَصَةٍ - ক্ষুধার, غَيْرَ - নয়, مُتَجَانِفٍ - ইচ্ছাকৃত ঝুঁকে, لِاِثْمٍ - গুনাহর প্রতি, فَاِنَّ - নিশ্চয় তবে, اَللّٰهُ - আল্লাহ, غَفُوْرٌ - ক্ষমাশীল, رَحِيْمٌ - মেহেরবান।

**নামকরণ :** এ সূরার পঞ্চদশ রুকূর مَائِدَةً শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। مَائِدَةً - অর্থ খাদ্য ভরা পাত্র। অন্যান্য সূরার মতো এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামের কোনো সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ এ নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময় :** এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে সমর্থন পাওয়া যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীর শেষ অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে এ সূরা নাযিল হয়। ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে নবী করিম (সা) চৌদ্দশত সাহাবী ও কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে ওমরা করার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। পথিমধ্যে কুরাইশ কাফিরগণ বাধা প্রদান করে। অনেক বাদানুবাদের পর আগামী বছর ওমরা করার অনুমতি দেয়া হয়। এতে মুসলমানদের কিছুটা সুবিধাও হয়। প্রথমতঃ পরবর্তী বছর ইসলামী নীতি অনুযায়ী ওমরা করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ কাফিরদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়েছিল যে, কাফিরগণ যেভাবে মুসলিমদের ওমরার পথে বাধা প্রদান করেছিল, অসংখ্য কাফির গোত্রের বাণিজ্য যাত্রার পথ মুসলিম অধিকৃত এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে তারাও অনুরূপভাবে কাফিরদের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো।

বিষয়বস্তুর বর্ণনাধারা অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে, এ সূরাটি এক সাথে একই সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। অবশ্য এর কোনো কোনো আয়াত অন্যান্য সময় নাযিল হলেও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার বিভিন্ন স্থানে স্থান করে দেয়া হয়েছে। যদি তা হয়েও থাকে তবে সূরা বর্ণনার ক্রমিক ধারা বা সামঞ্জস্যহীনতার বিন্দুমাত্র শূন্যতা অনুভূত হয় না। সেজন্য এ সূরাটিকে বিভিন্ন সূরার মিশ্রণের সমষ্টি ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই।

**শানে নুযূল :** সূরায়ে আলে ইমরান ও সূরা আন নিসার অবতরণ কাল থেকে এ সূরার অবতরণ কাল পর্যন্ত পৌঁছতে সামাজিক অবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এমন এক সময় ছিলো যখন ওহুদ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের জন্য মদীনার পরিবেশকেও বিপদ সঙ্কুলে পরিণত করেছিল। আর এমন সময় সমগ্র আরব দেশে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নাজদের সীমানা হতে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত, অপরদিকে লোহিত সাগরের বেলাভূমি হতে মক্কার নিকট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ওহুদ যুদ্ধের আঘাত মুসলমানদের সাহস হিম্মতকে চূর্ণ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে দৃঢ় বাসনা ও সংকল্প সৃষ্টির জন্য তীব্র চাবুকের ন্যায় কাজ করে। তারা আহত শার্দুলের ন্যায় মরিয়া হয়ে উঠে এবং মাত্র তিনটি বছরের মধ্যেই গোটা অঞ্চলের পরিবেশের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। মুসলিমদের অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা ও আত্মোসর্গের ফলে মদীনার চতুর্দিকে দেড় দুইশত মাইল পর্যন্ত বিরোধীদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো। হেজাযের ইহুদীগণ মদীনার উপর হামলা করার পরিবর্তে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করলো। ইসলামকে খতম করার শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত করেছে। তাতেও তারা নির্মমভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর আরববাসীদের আর কোনো সন্দেহ থাকলো না যে, ইসলামী আন্দোলনকে চূর্ণ করার শক্তি আর কারও নেই। ইসলাম এখন আর একটি আকীদা, বিশ্বাস বা আদর্শের পর্যায়ে পড়ে নেই; বরং ইসলাম এখন বাস্তব রূপ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

আর এর শাসন ক্ষমতা এলাকায় বসবাঁসকারী সমস্ত জনতার গোটা জীবনকেই গ্রাস করে ফেলেছে।

এ কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী মুসলমানরা একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায়ই মসজিদ ও জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। প্রত্যেক মহল্লা বা গোত্রের জন্য একজন করে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইসলামের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন রচনা করে নিজস্ব আদালতসমূহের মাধ্যমে তা কার্যকরী করা হয়েছিল। লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়ের পুরাতন নীতি বন্ধ করে ইসলামী নিয়ম পন্থা চালু করা হয়েছিল। মিরাস বণ্টন, বিবাহ-তালাক, পর্দা, অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ, যেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা দোষারোপের দণ্ড কার্যকরী হওয়ার ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবন একটি বিশেষ ধাচে গড়ে উঠতে শুরু করে ছিলো। মুসলমানদের উঠা-বসা, কথা-বার্তা, চাল-চলন, খানা-পিনা ও বসবাস করার পদ্ধতি, পোশাক-আশাক এক নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রূপ ধারণ করেছিল। ইসলামী জীবন ধারার এরূপ পরিপূর্ণ রূপায়ণ হওয়ার পর অমুসলিমগণ কিছুতেই আর এ আশা পোষণ করতে পারছিল না যে, মুসলিমগণ আর কোনো দিন তাদের সাথে মিলিত হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত কুরাইশ কাফিরদের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সংগ্রাম মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা ছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধির বাহ্যতঃ পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ প্রতিবন্ধকতা উৎপাটন করেছিল। এ সন্ধির ফলে নিরাপত্তা শুধু নিজেদের কর্মসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। আশপাশের অঞ্চলসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও তার ক্ষেত্র বিস্তারের অবাধ সুযোগ লাভ করেছিল। আর নবী করীম (সা) ইরান, তুরস্ক, মিসর ও আরবের বাদশা ও নৃপতিদের নামে লিখিত পত্রের মাধ্যমেই এর সূচনা করেছিলেন এবং সে সাথে বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারকগণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

**আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু :** সূরা আলে ইমরান ও আন নিসা নাযিল হওয়ার সময় থেকে এ সূরাটি নাযিলের সময় পর্যন্ত পৌঁছতে বিরাজমান পরিস্থিতির অনেক বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেয়। ওহুদ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের জন্য মদীনার নিকটবর্তী এলাকা ও পরিবেশকে বিপদ সঙ্কুল বানিয়ে দিয়েছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির বাহ্যিক পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ বিপদ সঙ্কুল পরিবেশকে দূর করে দিয়েছিল।

আজ কাফেরগণ মুসলমানদের দ্বীনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে। এখন ঈমানদারগণ আর কাফেরদেরকে ভয় করার কোনো কারণ নেই, ভয় করতে হবে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আজ থেকে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নেয়ামত ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বিপদে পড়ে গুনাহ্ করার প্রবণতা ব্যতীত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস খেয়ে ফেলে তবে আল্লাহ গুনাহ মাফকারী ও অনুগ্রহকারী।"

**ব্যাখ্যা :** (ক) اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.

"আজ তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করো।"

আজ বলতে কোন দিন বা তারিখ বুঝানো হচ্ছে না; বরং এর অর্থ সে যুগ বা কাল, যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। বর্তমান কালকে বুঝাতেও আজ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাফেরগণ তোমাদের দ্বীনের প্রতি পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন একটি স্থায়ী জীবন ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে এবং তার নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতায় কার্যকরী ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেররা এ দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়ার আশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাফেররা তোমাদেরকে পূর্বতন জাহেলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশা সম্পর্কেও নিরাশ হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো

না, বরং আমাকে ভয় করো অর্থাৎ এ দ্বীনের নির্দেশ ও এর আইন উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে এখন আর কোনো কাফেরি শক্তির প্রভুত্ব, আধিপত্য, বল প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতার বিপদের সম্ভাবনা নেই। এখন তোমাদের আল্লাহকে পুরোপুরি ভয় করে কাজ করা উচিত যাতে আল্লাহর হুকুম পালনে কোনো প্রকার অবহেলা না হয়। এখন তোমাদের নিকট ওযর আপত্তি করার কিছুই থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমরা রেহাই পেতে পারো।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"অতএব তোমরা তোমাদের সাধ্য মোতাবেক আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা শোনো, আনুগত্য করো ও খরচ করো, এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত তারাই কামিয়াব।" (সূরা আত-তাগাবুন : ১৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এমন একটা মানদণ্ড আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মুমিনের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহর দ্বীনে মানুষ শুধু ততটুকুর জন্যই দায়ী যতটুকু করার সাধ্য তার আছে। এ বিষয়ে সে নিজে যদি অবহেলা করে তাহলে সে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে না। তবে যা তার সাধ্যের বাইরে সেজন্য তাকে দায়ী করা হবে না।

(খ) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।"

দ্বীনকে সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ হলো এমন এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থারূপে স্থাপিত করা যাতে জীবনের যাবতীয় প্রশ্নের জওয়াব, সমস্যার সমাধান নীতিগত ও বিস্তারিত খুঁটিনাটিসহ বিদ্যমান

পাওয়া যায়। সঠিক পথে চলার পথ নির্দেশ ও আদেশ উপদেশ লাভ করার জন্য এ দ্বীনের বাইরে হাত বাড়াবার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না।

"নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দেয়ার অর্থ হেদায়াত বা জীবন পথের ব্যবস্থা দানের কাজ সম্পূর্ণ করা। "ইসলামকে একটি দ্বীন হিসেবে কবুল করে নেয়ার" অর্থ : তোমরা আমার দাসত্ব ও আনুগত্য করার যে স্বীকৃতি দিয়েছিলে, যেহেতু তোমরা তোমাদের চেষ্টা-সাধনা দ্বারা তা খাঁটি, আন্তরিক ও অকপট স্বীকৃতি বলে প্রমাণিত করেছো, তাই আমি এই দ্বীনকে আমার মঞ্জুরি ও কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করেছি। এখন তোমাদের আনুগত্যের মস্তক আমাকে ব্যতীত আর কারও নিকট অবনত করতে হবে না। তোমরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেরূপ মুসলিম হয়েছো, বাস্তব জীবনেও আমাকে ব্যতীত অন্য কারোর আনুগত্য করার বাধ্য-বাধকতা বোধ করা এখন আর তোমাদের উচিত নয়।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কষ্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

❑ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; (২) সলাত

.কায়েম করা; (৩) যাকাত দেয়া; (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমাযানের সিয়াম পালন করা। (বুখারী, হাদীস-৭, মুসলিম, হাদীস-২১)

(গ) فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"তবে যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ঐগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি জিনিস খেয়ে ফেলে গুনাহর প্রতি কোনো আকর্ষণ ছাড়াই, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।"

সূরা বাকারার ১৭২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম জিনিসের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

এক– যথার্থ অক্ষমতার মুখোমুখী হলে, যেমন– ক্ষুধা ও পিপাসায় প্রাণ সংহারক প্রমাণিত হতে থাকলে অথবা রোগের কারণে প্রাণ নাশে আশঙ্কা দেখা দিলে এবং এমতাবস্থায় হারাম জিনিস ব্যতীত আর কিছু পাওয়া না গেলে।

দুই– মনের মধ্যে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে।

তিন– প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করলে, যেমন– প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে পরিমাণ হারাম খাদ্য বা পানীয় একান্ত প্রয়োজন তার বেশী আহার না করা।

আল কুরআন বলে, সৎ কাজের পুরস্কার ও অসৎ কাজের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তিনি জ্ঞানী হওয়ার কারণে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অন্ধের মতো ব্যবহার করেন না। কোনো সৎ কাজের পুরস্কার দেয়ার সময় বান্দা আন্তরিকতা সহকারে সাচ্চানিয়তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এ সৎকাজটি করেছে কিনা, এদিক বিবেচনা করেই পুরস্কৃত করেন। আবার বিবেচনায় এদিকগুলো পাওয়া না গেলে তখন পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে বান্দার দ্বারা কোনো অসৎ কাজ হয়ে গেলে বান্দা লজ্জিত হয় এবং নিজে সংশোধন প্রয়াসী হলে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন।

মারাত্মক অপরাধী, কট্টর কাফেরের জন্যও নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, শর্ত হচ্ছে সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে, তাহলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

**শিক্ষা :** ১। নবী করীম (সা) এর বিদায় হজ্জের ঘোষণায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর ইসলাম নামক নেয়ামতকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।"

২। ইসলামের বিজয়ের সময় এসেছে। এখন আর কাফেরদেরকে ভয় করার প্রয়োজন নেই, ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে।

৩। যদি কোনো ব্যক্তি নিরূপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য কোনো নিষিদ্ধ জিনিস খেয়ে ফেলে, তারপর লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন।

৪। কোনো মারাত্মক অপরাধী কট্টর কাফেরও যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

**বাস্তবায়ন :** বিদায় হজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআন নাযিল সমাপ্ত করেন। ইসলামকে মানুষের জীবন ব্যবস্থা নামক নেয়ামত হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন। এ কথাগুলো সমাজে মানুষের মধ্যে অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ কথাগুলো জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করার জন্য তাওফীক কামনা করছি। আমীন ॥

## দারস : ১৮

# মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয়ের শাস্তি দিয়ে হেদায়াতের সুযোগ দান

### ৩০. সূরা আর রূম

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-৬০, রুকূ-৬**

**আলোচ্য আয়াত : ৪১।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٤١) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৪১) "মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা ফিরে আসবে।"

**শব্দার্থ :** ظَهَرَ - ছড়িয়ে পড়েছে, اَلْفَسَادُ - বিপর্যয়, فِى الْبَرِّ - স্থলভাগে, اَلْبَحْرِ - জলভাগে, بِمَا - এ কারণে যা, كَسَبَتْ - অর্জন করেছে, اَيْدِىْ - হাত, النَّاسِ - লোকদের, لِيُذِيْقَهُمْ - তাদের তিনি যেন আস্বাদন করান, بَعْضَ - কিছুটা, عَمِلُوْا - তারা কাজ করেছে, لَعَلَّهُمْ - তারা যাতে, يَرْجِعُوْنَ - ফিরে আসে।

**নামকরণ :** এ সূরার দ্বিতীয় আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ-এর 'রূম' শব্দটিকে নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল :** প্রথমেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময় চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো- "নিকটবর্তী দেশে রোমানরা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের নিকটবর্তী জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকা রোমানদের দখলে ছিলো। এসব এলাকায় রোমানদের উপর ইরানীদের বিজয় (৬১৫ খ্রি: বা নবুওয়াতের ৫ম বছর) পূর্ণতা লাভ করে। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় যে বছর হাবশায় হিজরত করা হয়।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম ও হযরত মুহাম্মাদ (সা) সত্যনবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে অতি উজ্জ্বল একটি প্রমাণ। এ প্রমাণটি বুঝে নেয়ার জন্য এ আয়াতগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলির একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী করীম (সা)-এর নবুয়তের আট বছর পূর্বের ঘটনা। রোমের কায়জার মুরিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ফোকাস নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন দখল করে। সে কায়জারের চোখের সামনে তার পাঁচ পুত্রকে হত্যা করে। পরে স্বয়ং কায়জারকেও হত্যা করে। পিতা-পুত্রের মাথা কনষ্টান্টিনোপলের রাজপথে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। কয়েকদিন পর কাইজারের স্ত্রী ও তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার পর ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক সুযোগ পেয়ে যান।

কাইজার মুরিস ছিলেন খসরু পারভেজের অনুগ্রাহক। কাইজার মুরিসের সহায়তায় খসরু পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই খসরু পারভেজ, কাইজার মুরিসকে পিতা বলতেন। খসরু পারভেজ ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে ফোকাস মুরিসের স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, গোটা পরিবারকে হত্যা করে যে যুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। খসরু পারভেজ (৬০৩ খ্রি:) রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে পর পর পরাজিত করে কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়া মাইনরের এডিসা (অরফা), অন্যদিকে সিরিয়ার হাল্‌ব ও আন্তাকিয়া পৌছে যান। রোমের রাজপরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ

রক্ষা করতে পারছে না, তখন তারা আফ্রিকার গভর্নরের সাহায্য চাইলো। গভর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীসহ কনষ্টান্টিনোপলে পাঠান। তার সেখানে পৌছে যাবার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করে হিরাক্লিয়াসকে কাইজার পদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতোপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিলো ৬১০ খ্রি: এর ঘটনা। এ বছরই হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজির ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা খতম হয়ে যায়। যদি সত্যই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কাইজারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তিনি তা না করে অগ্নি উপাসক ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খ্রিস্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (নাস্তুরী, ইয়াকূবী, মাজুসী), তাদের সব সহানুভূতি ও স্বহৃদয়তা মাজুসী আক্রমণকারীদের প্রতি হয়ে গেলো। আর ইহুদীরাও মাজুসীদের সমর্থন করলো। এমনকি খসরু পারভেজের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হওয়া ইহুদীদের সংখ্যা ২৬ হাজার পর্যন্ত পৌছে ছিলো।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের গতিরোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পর পরই প্রথম যে সংবাদটি তাঁর কাছে পৌছে সেটি ছিলো ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। এরপর ৬১৩ সালে তারা দামেস্ক দখল করে। ৬১৪ খ্রি: বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খ্রিস্টান জগতের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খ্রিস্টানকে এ শহরে হত্যা করা হয়। আল কিয়ামাহ গীর্জা ধ্বংস করা হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি, যা সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, হযরত মসীহকে তাতেই শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল। এটাকে ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌছে দেয়। আর্চবিশপ

যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা ভেঙ্গে ফেলা হয়।

খসরু পারভেজ এর বিজয়ের নেশা মাকদিস থেকে লিখিত পত্রটি পড়লেই আন্দাজ করা যায়। তাতে তিনি হিরাক্লিয়াসকে লিখেছিলেন, "সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে– "তুমি বলে থাকো, তোমার খোদার প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষা করলেন না কেন?"

এরপর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্ডান, ফিলিস্তিন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত মিসর পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটায়। এটা এমন এক সময় ছিলো যখন মক্কা মুআয্যমায় এর চেয়েও আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রত ছিলো। অবস্থা এমন হয়েছিল যে ৬১৫ খ্রি: তে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাব্‌শায় হিজরত করতে হয়েছে। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয়ের কথা ছিলো সবার মুখে মুখে। মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছিল। তারা মুসলমানদেরকে বলতো, দেখো ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয় লাভ করেছে এবং অহী ও নবুওয়াত অনুসারী খ্রিস্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলেছে। অনুরূপভাবে আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

এ অবস্থায় কুরআন মাজীদের এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এখানে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়। একটি হচ্ছে রোমানরা জয়লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময়ে বিজয় লাভ করবে। এ দু'টি ভবিষ্যৎ বাণীর কোনো একটিরও কয়েক বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোনো দূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিল। এ ভবিষ্যত বাণীর পরও ৮ বছর পর্যন্ত কোনো দিক

থেকে তাদের বিজয় লাভের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিসর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। অগ্নিউপাসক সেনাদল ত্রিপোলির সন্নিকটে পৌঁছে তাদের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছিল। এশিয়া মাইনরে পারসিক সৈন্যরা রোমানদের মেরে বসফোরাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা কনষ্টান্টিনোপলের সামনে খালেদুন বর্তমান নাম কাজীকুই দখল করে বসে। কাইজার খসরুর নিকট দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরজ করলো যে, সে যে কোনো মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু এর জবাবে সে বললো, "এখন কাইজার পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় আমার সামনে এসে দাঁড়াবে এবং শূলবিদ্ধ খোদাকে ছেড়ে অগ্নি খোদার উপাসনা করে চলবে।"

শেষ পর্যন্ত কাইজার চরম পরাজয় স্বীকার করতে রাজি হয়, এমনকি সে কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন এর কথানুসারে কুরআন মাজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর অবস্থা এমন হয়েছিল যে রোমান সাম্রাজ্য কোনো দিন ইরানীদের উপর বিজয়ী হতে পারবে এমন ধারণা পর্যন্ত কেউ করতে পারছিল না। বিজয়তো দূরের কথা, এ রাজ্যটি টিকে থাকতে পারবে এমন আশা কারো ছিলো না। কুরআনের আয়াত নাযিল হলে মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উবাই ইবনে খাল্‌ফ হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে এ শর্ত করলো যে, তিন বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হলে আমি দশটি উট দেব। অন্যথায় তোমাকে দশটি উট দিতে হবে।

নবী করীম (সা) এ শর্তের কথা জানার পর হযরত আবু বকর (রা)-কে ডেকে আল কুরআনের ইশারা অনুযায়ী পুনরায় নতুন শর্ত করে নিলেন যে দশ বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হলে আমি একশত উট দেবো। অন্যথায় তুমি একশত উট দেবে।

(৬২২ খ্রি:) একদিকে নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনা চলে যান। অন্যদিকে কাইজার হিরাক্লিয়াস নীরবে কনষ্টান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণ সাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওনা করেন। সেখানে যেয়ে হঠাৎ পেছন

দিক থেকে ইরানের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কাইজার গীর্জার নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস খ্রিস্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূর) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জার ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থসম্পদ সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্টের জন্মস্থান আরামীয়াহ ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস করেন। আল্লাহর মহিমা, এ বছরই মুসলিমগণ বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মুকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। এভাবে সূরা রূমে উল্লিখিত দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের আগেই একই সঙ্গে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর অনবরত ইরানীদেরকে একের পর এক পর্যদুস্ত হতে হয়। ৬২৭ খিষ্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, এমন কি সম্রাটের আবাসস্থল পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যগণ এগিয়ে যেতে যেতে ইরানের তখনকার রাজধানী তায়াসকুনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে খসরুর পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮ জন পুত্রকে হত্যা করা হয়। কয়েকদিন পর কারাগারের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার মৃত্যু হয়।

এ বছরই হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কুরআন মহাবিজয় নামে আখ্যায়িত করে। খসরুর পুত্র ২য় কুবাদ রুম অধিকৃত সকল এলাকা থেকে অধিকার ত্যাগ করেন এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করেন। ৬২৯ সালে পবিত্র ক্রুশকে স্বস্থানে রাখার জন্য কাইজার নিজে "বাইতুল মাকদিস" যান, আর এ বছরই নবী করীম (সা) কাযা ওমরা আদায় করার জন্য হিজরতের পর প্রথমবার মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশ করেন।

আল কুরআনের ভবিষ্যৎ বাণী যে পুরোপুরি সত্যে পরিণত হয়েছিল, এতে কারও সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। উবাই ইবনে খাল্‌ফ এর উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকর (রা)-কে একশত উট দিতে হয়। তিনি সেগুলো নবী কারীম (সা)-এর খেদমতে হাজির করেন। বাজি যখন ধরা হয় তখন জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। তাই তখন এগুলো সদাকা করে দেয়ার নির্দেশ জারি হয়।

**বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য** 'আজ রোমানরা পরাজিত, লোকেরা মনে করে এ রাজ্যের পতন অতি আসন্ন'-দিয়েই সূরা আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন আসবে। যারা পরাজিত হয়েছে তারা বিজয়ী হবে।

এ ভূমিকা থেকে জানা গেলো যে, মানুষ তার স্থূল দৃষ্টির কারণে বাহ্যত তাই দেখতে পায় যা বাহ্যিকভাবে তার চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ বাহ্যিক অবস্থার অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার কোনো খবরই তার নেই। দুনিয়ার এ সামান্য ও সাধারণ ব্যাপারে মানুষের এ বাহ্য দৃষ্টি যখন ভুল ধারণা-অনুমান করার কারণ ঘটে, ফলে কি হবে না হবে, তা না জানার কারণে মানুষ ভুল ধারণা অনুমান করতে বাধ্য হয়। তখন সামগ্রিকভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করা এবং তারই ভিত্তিতে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজিকে ব্যয় করা যে কত বড় ভুল তা ভুক্তভোগী জানে।

এভাবে রোম ও পারস্য সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণের লক্ষ্য পরকালের দিকে ঘুরে গেলো এবং ক্রমাগত তিন রুকু পর্যন্ত নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, পরকাল খুবই সম্ভব, যুক্তিসঙ্গত ও তার প্রয়োজনও রয়েছে এবং মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্যে পরকালের প্রতি সন্দেহাতীত ঈমান পোষণ করা ও তারই আলোকে বর্তমান জীবনের কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন।

এ পর্যায়ে পরকাল সম্পর্কে যুক্তি (প্রমাণ) পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব লোকের যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তার দ্বারা তাওহীদও প্রমাণিত হয়। তাই চতুর্থ রুকুর প্রথম থেকেই ভাষণের লক্ষ্য আরোপিত হয় তাওহীদের প্রমাণ ও শিরক বাতিলকরণের উপর। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য স্বভাবসম্মত দ্বীন এ হতে পারে যে, সে সর্বোতভাবে একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবে। শিরক বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বিপরীত ও বিরোধী। তাই মানুষ যেখানেই এ ভুলনীতি গ্রহণ করেছে সেখানেই বিপর্যয় হয়েছে। সে সময়ের দুনিয়ার দু'টি বড় রাষ্ট্র শক্তির মধ্যে যুদ্ধের ফলে যে চরম ও ব্যাপক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তারই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরা সবাই মুশরিক ছিলো।

উপসংহারে বলা হয়েছে, মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা যমীন, আল্লাহর পাঠানো বৃষ্টির ধারা নেমে আসলে যেমন নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠে ও নবজীবন এবং তারুণ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার বাইরে প্রকাশ করতে শুরু করে, তদ্রূপ আল্লাহর পাঠানো অহী ও নবুওয়াত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা মানবতার পক্ষে রহমতের এক অপূর্ব বর্ষণ হয়ে দেখা দেয়। অহী ও নবুওয়াতের সাহায্যে মানবতার মধ্যে নবজীবনের ক্রমবৃদ্ধি ও মহাকল্যাণ এবং মঙ্গলের বাহক হয়েছে। এর কল্যাণে আরবের মরা যমীন আল্লাহর রহমতে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।

সকল কল্যাণের ধারা তোমাদের জন্যই প্রবাহিত হবে। আর কল্যাণ লাভ না করলে নিজেদের ক্ষতি সাধন করবে। সময় ও সুযোগ হারিয়ে অনুতাপ ও আফসোস করলে কোনোই ফায়দা হবে না, ক্ষতি পূরণেরও কোনো সুযোগ থাকবে না।

**ব্যাখ্যা :** بَرٌّ দ্বারা মানুষের সুপরিচিত স্থলভাগ বুঝানো হয়েছে। আর بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমুদ্রকে, যা মানুষের নিকট পরিচিত।

তখনকার আমলে রোম ও ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল এবং যার আগুন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কর্মফলটা হলো "লোকদের স্বহস্তের উপার্জন।" অন্যায় পথে চলতে গেলেই ফাসেকী, অশ্লীলতা, যুলুম ও নিপীড়নের এমন একটি ধারা (যা শিরক ও নাস্তিক্যবাদের আকীদা বিশ্বাস অবলম্বন ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার ফলে) অনিবার্যভাবে মানবিক নৈতিক গুণাবলী ও চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। "হয়তো তারা বিরত হবে" এর অর্থ হচ্ছে– আখেরাতে শাস্তি লাভ করার পূর্বে আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানুষের কিছু খারাপ কাজের ফল ভোগ করান, এর ফলে সে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবে, আর নিজের চিন্তাধারার ভুল-ভ্রান্তি উপলব্ধি করে সঠিক পথে ফিরে আসবে। নবীগণ সর্বদা মানুষের সামনে যে সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপন করে এসেছেন, যা ছাড়া মানুষের কর্মধারাকে সঠিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন সূরায়ে আস সাজদায় ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

"সে বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোনো না কোনো) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকবো, হয়তো তারা বিরত হবে।"

"বড় শাস্তি" বলতে আখেরাতের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। কুফরি ও ফাসেকীর অপরাধে এ শাস্তি দেয়া হবে। বড় শাস্তির মুকাবিলায় ছোট শাস্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষ যেসব কষ্ট পায় সেগুলো। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন রোগ, নিজের প্রিয়তম লোকের মৃত্যু, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ক্ষতি, ব্যর্থতা ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, যুদ্ধ এবং আরও বহু আপদ-বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ও এর কল্যাণকর দিক বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ফলে বড় শাস্তি ভোগ করার আগেই যেন মানুষ সচেতন হয়ে যায় এবং এমন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ত্যাগ করে যার পরিণামে তাদেরকে এ বড় শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্য কথায় এর অর্থ হবে, দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষকে একেবারেই পরম আনন্দে রাখেননি। নিশ্চিন্তে ও আরামে জীবনের গাড়ি চলতে থাকলে মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যে তার চেয়ে বড় আর কোনো শক্তি নেই, আর কোনো ক্ষতি করতে পারে।

বরং আল্লাহ এমন অবস্থা করে রেখেছেন যার ফলে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও দেশের উপর এমন সব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে একদিকে নিজেদের অসহায়তা এবং অন্যদিকে নিজেদের চেয়ে বড় ও উর্ধ্বে একটি মহাপরাক্রমশালী সর্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার অনুভূতি দান করে। এ বিপদ প্রত্যেকটি ব্যক্তি, দল ও জাতিকে এ কথা স্মরণ করে দেয় যে, তোমাদের ভাগ্য উপরে অন্য একজন নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবকিছু তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। আসল ক্ষমতা রয়েছে ওর হাতে যিনি কর্তৃত্বসহকারে এসব কিছু করে চলছেন। তাঁর পক্ষ থেকে যখনই কোনো বিপদ তোমাদের উপর আসে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা তোমরা গড়ে তুলতে পারো না এবং কোনো জিন, রূহ, দেব-দেবী, দেও-দানব, নবী বা অলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেও তার পথরোধ করতে পারো না।

প্রকৃত বিচার করতে গেলে দুনিয়ার এ বিপদ আখেরাতের বিপদের তুলনায় কোনো বিপদ নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধান ও সতর্ক সংকেত। মানুষকে সত্য জানবার এবং তার বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একে পাঠানো হয়। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ যদি দুনিয়াতেই নিজের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয় তাহলে আখেরাতে আল্লাহর বড় শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।

আরও প্রমাণের জন্য দেখুন সূরায়ে তাওবা : ১২৬ আয়াত, আর রা'দ : ২১, আত্‌তূর : ৪৭ আয়াত।

**শিক্ষা :** ১। অসৎ কর্মফলের কিয়দংশের প্রতিফলন ইহজগতে ঘটিয়ে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা করে থাকেন।

২। নবীগণের পথ ব্যতীত মানুষের কর্মধারাকে সঠিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

৩। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিপর্যয়কে (যা মানুষের হাতের কামাই) ভয় করে দ্রুত সঠিক পথে ফিরে আসা এবং পরিবার পরিজনকেও ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

**বাস্তবায়ন :** মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের হেদায়াতের জন্য মানুষকেই আল্লাহ্ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের কর্মফলের জন্যই জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দেয়। সুনামী, সাইক্লোন, বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি আমাদের সাবধান ও হেদায়াতের জন্যই সৃষ্ট হয়। এগুলো আমাদের কর্মফলেরই কিয়দংশ। তাই আসুন আমাদের সমাজের অসৎ কর্মগুলোর উচ্ছেদ করে, সকলেই সৎকর্মশীল হয়ে যাই। তাহলে আল্লাহর সৃষ্টিতে আর বিপর্যয় নেমে আসবে না, বরং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত নেমে আসবে। হে আল্লাহ্ তাওফীক দাও, আমীন ॥

## দারস : ১৯

# মহান আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে দলবদ্ধভাবে লড়াই করে

## ৬১. সূরা আস্ সফ

**মদীনায় নাযিল : আয়াত-১৪, রুকূ-২**

**আলোচ্য আয়াত : ১-৪।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ. (٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَتَفْعَلُوْنَ. (٤) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِه صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। (২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো যা নিজেরা করো না? (৩) আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলো যা নিজেরা করো না। (৪) আল্লাহ সেসব লোকদের ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা (সীসা গলিয়ে ঢালাই করা) এক মজবুত দেয়াল।"

**শব্দার্থ :** سَبَّحَ - তাসবীহ করে, السَّمٰوٰت - আসমানসমূহের মধ্যে,

الْاَرْضِ- যমীনে, اَلْعَزِيْزُ - পরাক্রমশালী, اَلْحَكِيْمُ - প্রজ্ঞাময়, لِمَ - কেন, تَقُوْلُوْنَ - তোমরা বলো, مَا - যা, لاَ - না, تَفْعَلُوْنَ - তোমরা করো, كَبُرَ - অতিশয়, مَقْتًا - ক্রোধজনক, عِنْدَ - নিকট, اَنْ- যে, تَقُوْلُوْا- তোমরা বলো, مَا - যা, لاَ - না, تَفْعَلُوْنَ - তোমরা করো, اِنَّ- নিশ্চয়ই, يُحِبُّ - পছন্দ করেন, اَلَّذِيْنَ - তাদেরকে যারা, يُقَاتِلُوْنَ- লড়াই করে, فِىْ سَبِيْلِهِ - তাঁর পথে, صَفًّا - সারিবদ্ধ হয়ে, كَاَنَّهُمْ- তারা যেন, بُنْيَانٌ - প্রাচীর, مَرْصُوْصٌ - সুদৃঢ়।

**নামকরণ :** এ সূরার চতুর্থ আয়াতের বাক্যাংশ- يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا থেকে (صَفًّا) সফ শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গৃহিত হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল :** কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিলের সময়কাল পাওয়া যায় না। এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায় যে, ওহুদ যুদ্ধের (তৃতীয় হিজরী) সমসাময়িককালে এ সূরা নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এ সূরার বিষয়বস্তুতে যে অবস্থাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা এ সময়েই বিরাজ করছিল।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা কয়েকজন মসজিদে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এ আলোচনার ভেতর একটি প্রশ্ন দেখা দিল যে, আল্লাহ তা'আলা নিকট কোন্ আমল সবচেয়ে প্রিয়? এ আমলটির খবর জানতে পারলে আমরা এ আমলটি করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারতাম। নবী করিম (সা) নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রেরিত দূত এসে প্রত্যেককে নাম ধরে ডেকে তার নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা সকলে একত্রিত হলে এ পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। এ সূরার মধ্যেই সে প্রিয় আমলটি নিহিত আছে।

**বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :** ঈমানের ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ ও আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করাই হলো এ সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু। এতে– ১। দুর্বল ঈমানদার, ২। ঈমানের মিথ্যা দাবিদার, ৩। ঈমানের

ব্যাপারে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান, ৪। মুনাফিক ইত্যাদি ধরনের লোকদের মধ্যে কোন্ আয়াতে কোন্ ধরনের লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে তা কথার ধরন থেকেই বুঝা যায়। শুরুতেই সমস্ত ঈমানদারকে সাবধান করা হয়েছে এ বলে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাধিক ঘৃণ্য ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা মুখে বলে এক কথা আর কাজে করে তার বিপরীত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাদের মহব্বত করেন যারা আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্যে ইস্পাত নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৫ম-৭ম আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম (সা) এর উম্মতকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রাসূল ও তোমাদের দ্বীন ইসলামের সঙ্গে এমন আচরণ হওয়া উচিত নয় যা মূসা (আ) ও ঈসা (আ) এর সঙ্গে বনী ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল। হযরত মূসা (আ) কে তারা সত্য নবী ও রাসূল জানা সত্ত্বেও তারা তাঁকে নানা প্রকারের কষ্ট দিতো। আর হযরত ঈসা (আ) এর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষভাবে দেখার পরও তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতো না। এর ফলে এ জাতির মন মেজাজের গঠন প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গেলো। হেদায়েত থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলো।

৮ম ও ৯ম আয়াতে দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী খৃষ্টান ও তাদের দোসর মুনাফিকরা আল্লাহর এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন এ নূর পূর্ণ জাঁকজমকসহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই। আর মুশরিকদের পক্ষে যত অসহ্যই হোক না কেন, রাসূলের প্রচারিত দ্বীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দ্বীন ও ধর্মের উপর পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হবেই।

১০-১৩শ আয়াতে ঈমানদার লোকদের বলা হয়েছে– ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় হলো সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ও জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

পরকালে ঈমান ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে গুনাহসমূহের ক্ষমা, জান্নাত লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর দুনিয়ার পুরস্কার হবে খোদার সাহায্য-সহযোগিতা, বিজয় ও সাফল্য।

সূরার শেষ ভাগে ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)

কে হাওয়ারীরা যেরূপে আল্লাহর পথে সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন করেছিলেন, অনুরূপভাবে তারা যেন আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে আগের কালের ঈমানদার লোকদের মতো তারাও কাফেরদের মুকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে।

**ব্যাখ্যা :** (ক) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ...

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তাসবীহ্ করছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।"

বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদাসর্বদা সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে এ বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সব রকম দোষত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীও পবিত্র। এখানে অতীতকাল নির্দেশক শব্দরূপ سَبَّحَ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এ যে, বিশ্বজাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণু চিরদিন তার স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. এ বাক্যের শুরুতেই هُوَ শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ শুধু তাই নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র তিনিই এমন সত্তা যিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। عَزِيْزٌ শব্দের অর্থ-পরাক্রমশালী, শক্তিমান, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী, যার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন জগতের কোনো শক্তিই রোধ করতে পারে না, যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাধ্য কারো নেই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার আনুগত্য সবাইকে করে যেতে হয়, অমান্যকারী কোনোভাবেই তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حَكِيْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যা কিছু করেন, জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে করে থাকেন। তাঁর সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, শাসন, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোনো কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।

কুরআন মাজিদে আল্লাহর গুণবাচক নাম عَزِيْزٌ এর সাথে حَمِيْدٌ - غَفُوْرٌ - رَحِيْمٌ - عَلِيْمٌ - حَكِيْمٌ - وَهَّابٌ - হওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মানুষ জানতে পারে যে, আল্লাহ এ বিশ্বজাহান শাসন ও পরিচালনা করছেন, একদিকে তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না, অপরদিকে তিনি حَكِيْمٌ বা মহাজ্ঞানীও বটে। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সরাসরি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তিনি عَلِيْمٌও। যে ফয়সালাটি তিনি করেন জ্ঞান অনুযায়ী করেন। তিনি رَحِيْمٌও। নিজের অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি غَفُوْرٌ। অধীনস্থদের সাথে ছিদ্রান্বেষণ বা খুঁত ধরার মানসিকতা তাঁর নেই বরং ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন। তিনি وَهَّابٌও। নিজের অধীনস্থদের সাথে কৃপণতার আচরণ করেন না। বরং চরম দানশীলতা ও বদান্যতার আচরণ করেছেন। তিনি حميد। তাঁর সত্তায় প্রশংসার যোগ্য সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণতার সমাহার ঘটেছে।

সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী, পরিবর্তনকারী বা পুনর্বিবেচনাকারী কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাইরের শক্তি থাকবে না এবং তাঁর আনুগত্য করা ব্যতীত কারো কোনো উপায়ও থাকবে না। এ বিশ্বজাহানে নিরংকুশ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ নেই। আর কেবল তিনিই সীমাহীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা যিনি নিষ্কলুষ হাকীম, আলীম, রহীম, গফুর, হামীদ ও ওয়াহহাব।

তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে দুনিয়ার কোনো শক্তি যদি সামান্যতম সাহায্য ও সহযোগিতা না করে বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হয় তবুও তাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

(খ) (২) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. "হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা এমন সব কথা কেন বলো– যা তোমরা (নিজেরা) করো না।"

(٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ. "আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে যা তোমরা করবে না।"

২নং আয়াতটি পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায় যে, দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে কথা বলা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্য হলো একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার সৎ সাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। ঈমানের দাবী পোষণকারী কোনো লোকের পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মুমিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ এ স্বভাব মুনাফিকের একটি আলামত। নিম্নলিখিত হাদীসে তার প্রমাণ মেলে :

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ) اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا ائْتُمِنَ خَانَ.

(بخاری - مسلم)

"মুনাফিকের পরিচয় তিনটি (ইমাম মুসলিম আরও বাড়ান যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে) সেগুলো হলো, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোনো আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করিম (সা) অন্য একটি হাদীসে বলেছেন :

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعْهَا : اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ - وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ - وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

(بخاری - مسلم)

“চারটি স্বভাব এমন যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া করলে নৈতিকতা ও দ্বীনদারীর সীমালঙ্ঘন করে।”

কোনো কাজের ওয়াদা করলে তা গুনাহের কাজ হলে অবশ্যই করবে না। কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফ্ফারা পূরণ করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ নং আয়াতে এ কথাটিই বলা হয়েছে।

তারাইতো কোনো এক সময় বলেছিল, এমন একটি আমলের খবর যদি জানতে পারতাম যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্ বেশী খুশী হন। কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো, যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল, তখন নিজেদের কথা রক্ষা করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। ওহুদের যুদ্ধে এসব লোক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তারা নবীকে (সা) ফেলে রেখে জান নিয়ে পালিয়ে ছিল।

(গ) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِه صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ. (٤)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা সেসব লোকদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল।”

কেবল সে ঈমানদারগণই আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণ পণ করে কাজ করে। তিনটি গুণবিশিষ্ট সেনাদলকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। এক. যারা বুঝে শুনে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোনো পথে লড়াই করবে না যা ফী সাবীলিল্লাহর পথে পড়ে না। দুই. তারা বিচ্ছিন্ন বা শৃঙ্খলহীনতার শিকার হবে না বরং মজবুত, সুসংহত সংগঠন, কাতারবন্দী ও সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে। তিন. শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে সুদৃঢ় দেয়ালের মতো। সুদৃঢ় দেয়ালের মতো,

কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোনো সেনাবাহিনী ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবে:

ক) আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোনো সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

খ) পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার উপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মতো কঠিন পরীক্ষা কারো কোনো দোষ ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

গ) নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সে মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।

ঘ) উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী (সা) এর নেতৃত্বে যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনো শক্তি যার মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি, এসব গুণ ও বৈশিষ্টই ছিল তার ভিত্তি।

**শিক্ষা :** ১। আসমান, যমীনে আল্লাহর সৃষ্টি যা কিছু আছে তারা অবিরত মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও পরম করুণাময় আল্লাহর যিক্‌র করছে।

২। নিজের নিকট পছন্দনীয় নয় অথচ অন্যকে তা করতে বলা আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয়।

৩। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর দ্বীনের পথে সীসা ঢালা মজবুত প্রাচীরের মতো লড়াই করে।

**বাস্তবায়ন :** দ্বীন ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন (ধর্ম)। আল্লাহর মনোনীত ইসলামী শাসন সমাজে কায়েম করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নামই জিহাদ। জিহাদ করতে হবে আল্লাহর রাস্তায় জান এবং মাল দিয়ে। প্রথমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তারপর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের সদস্যদের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার জন্য এবং ইসলামী সংগঠনের সাথে একাত্মতা ঘোষণার মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে শামিল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নামই জিহাদ। এ জিহাদের দ্বারা আমরা ইসলামী সমাজ কায়েম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল করে ধন্য হবো। ওয়ামা তাওফীকি ইলা বিল্লাহ।

## দারস : ২০

# আল কুরআন মুমিনদের জন্য উপদেশ ঔষধ, পথ প্রদর্শক এবং অনুগ্রহ

## ১০. সূরা ইউনুস

**মক্কায় নাযিল : আয়াত-১০৯, রুকূ-১১**

**আলোচ্য আয়াত : ৫৭।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٥٧) يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۤءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

**অনুবাদ :** (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) "হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নসিহত এসে গেছে। এটা অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী এবং মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত।"

**শব্দার্থ :** يٰاَيُّهَا - হে, اَلنَّاسُ - মানব সমাজ, قَدْ - নিশ্চয়ই, جَاۤءَتْكُمْ - তোমাদের নিকট এসেছে, مَوْعِظَةٌ - উপদেশ, مِنْ - পক্ষ থেকে, رَبِّكُمْ - তোমাদের রবের, شِفَاۤءٌ - আরোগ্য, لِمَا - তার জন্য, اَلصُّدُوْرُ - অন্তরসমূহের, هُدًى - হেদায়েত, رَحْمَةٌ - রহমত, لِلْمُؤْمِنِيْنَ - ঈমানদারদের জন্য।

**নামকরণ :** এ সূরার ৯৮ নং আয়াতে হযরত ইউনুস (আ) এর কথা এসেছে, তাই নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে "সূরায়ে ইউনুস"। আসলে সূরার আলোচ্য বিষয় ইউনুস (আ) নয়।

**নাযিলের সময়কাল :** এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। এটা বিভিন্ন ভাষণের সমষ্টি নয়, বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা একটা সুবিন্যস্ত ভাষণ। এ সূরার বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এটা মক্কী যুগের শেষ সময়ের অর্থাৎ হিজরতের আলামতবিশিষ্ট সূরাগুলোর আগে নাযিল হয়ে থাকবে।

**বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :** এ ভাষণটির বিষয়বস্তু হচ্ছে দাওয়াত বুঝানো, অনুভূতি দান ও সতর্কীকরণ। সূচনালগ্নে ভাষণটি শুরু হয়েছে এভাবে : একজন মানুষ নবুয়াতের পয়গাম পেশ করছে দেখে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছে, আর শুধু শুধুই তাঁকে কখনও যাদুকর আবার কখনও গণক বলে অভিযোগ দিচ্ছে। অথচ তিনি যে কথা বলছেন তাতে না আছে যাদু আর না আছে গণকদারির কোনো বিষয়। তিনি তো তোমাদেরকে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবগত করেছেন। প্রথমটি হলো আল্লাহ এ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি সবকিছুর মালিক। তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

আর দ্বিতীয়টি হলো মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশ নেয়া হবে। যার নেকের পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাত আর যার নেকের পাল্লা হালকা হবে সে জাহান্নাম লাভ করবে।

নবী করিম (সা) এ দু'টি মহাসত্য তোমাদের সম্মুখে পেশ করেছেন। তোমরা মানো আর না মানো এটাই অকাট্য সত্য ও অনস্বীকার্য। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তোমাদের জীবন পরিচালনার জন্য তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন। তাঁর এ দাওয়াত কবুল করে নিলে তোমাদের পরিণামে কল্যাণ হবে আর অমান্য করলে অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে।

**ব্যাখ্যা :** يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۤءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ لا وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

“হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এমন এক ব্যবস্থাপত্র এসেছে যা নসিহতে পরিপূর্ণ এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী আর মুমিনদের জন্য সেটা পথপ্রদর্শক ও রহমত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর ইহসানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমাদেরকে যে পবিত্র গ্রন্থটি দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে নসিহতে পরিপূর্ণ একটি দফতর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা তোমাদের অন্তরের সমস্ত রোগের মহৌষধ। এটা তোমাদের অন্তরের সন্দেহ সংশয়, কালিমা ও অপবিত্রতা দূরকারী। আল কুরআনের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত ও রহমত লাভ করতে পারবে। কিন্তু এটা লাভ করতে পারবে একমাত্র তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে।

এ দুনিয়ার জীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততটুকুই, যতটুকু সময় তোমরা এ দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছো। এ সময়টুকু যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদায়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের চেষ্টা না করো, তাহলে তোমরা আর দ্বিতীয় কোনো সুযোগ পাবে না।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি কুরআনকে মুমিনদের জন্যে শিফা ও রহমতস্বরূপ অবতীর্ণ করেছি। কিন্তু পাপীদের জন্যে এটা ধ্বংস ও ক্ষতি সাধনকারী, (সূরা ইসরা : ৮২)।

হে নবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, এ কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা, তাই এটা পেয়ে তোমরা আনন্দিত হও। আর তোমরা দুনিয়ার যেসব ক্ষণস্থায়ী ভোগ্যবস্তু লাভ করেছ, সেগুলো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও অমূল্য সম্পদ হচ্ছে এ কালামে পাক আল কুরআন।

হযরত উমর (রা) এর নিকট ইরাকের খেরাজ আসলে তিনি তা দেখার জন্য তাঁর খাদেমসহ বেরিয়ে আসেন। উমর (রা) খেরাজে আগত উটগুলো গণনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু গণনায় অপারগ হয়ে বলে উঠেন : আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ অবস্থা দেখে তাঁর খাদেম

বলে উঠেন, আল্লাহর কসম! এটাতো আল্লাহর খাস অনুগ্রহ ও রহমত ছাড়া আর কিছু নয়। তখন উমর (রা) বলেন, না এটা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ বলে কুরআন ও এর দ্বারা উপকার গ্রহণ বুঝিয়েছেন। সুতরাং এ খেরাজের সম্পদগুলোকে আল্লাহর ফযল ও রহমত মনে না করে مِمَّا يَجْمَعُوْنَ বা জমাকৃত সম্পদ মনে করাই উচিত। দুনিয়ার জীবনে আমরা যে লিল্লাহ দান করি সেগুলো اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ (সূরায়ে তাগাবুন, আয়াত-১৭) আল্লাহ বহুগুনে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহর ফযল ও রহমত তো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এর মাহাত্ম্য আর ও অতি বেশী।

মহান আল্লাহর নাযিলকৃত আলো অর্থ কুরআন। আলো যেমন নিজেই সমুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয় এবং আশ-পাশে অন্ধকারে ঢাকা সব জিনিসকে স্পষ্ট ও আলোকিত করে দেয়, তেমনি কুরআন মাজিদও এমন এক আলোকবর্তিকা, যার সত্যতা আপনা থেকেই স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম যেসব সমস্যা বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়, কুরআনের আলোকে মানুষ সেসব সমস্যা সহজেই বুঝতে পারে। যার কাছেই এ আলোকবর্তিকা থাকবে সে চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথের মধ্যেও ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।

**শিক্ষা :** ১। নসিহতে পরিপূর্ণ আল কুরআন হলো, অন্তরের সকল রোগের আরোগ্যকারী ও মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক, হেদায়াত ও রহমত।

২। আখেরাতের শান্তির জন্য দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চাবিকাঠি এ কুরআন, এ পথ ব্যতীত আখেরাতে পাড়ি দেয়ার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

৩। দুনিয়ার যে কোনো বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হলো, আল কুরআন।

৪। আল কুরআনের ন্যায় ও আলোকবর্তিকায় পথ চলতে যারা অভ্যস্থ তারা চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য বাঁকা পথের মধ্যেও ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ স্পষ্টভাবেই দেখতে পাবে।

৫। মুমিনদের পথ চলার বিধান হলো, আল কুরআন।

**বাস্তবায়ন :** আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়ায় প্রেরিত সকল জাতি অপেক্ষা মানব জাতি হলো, আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ জাতি। এ জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য জীবন বিধান বা হেদায়াতনামা এসেছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তার নাম হলো, আল কুরআন।

সুতরাং আল কুরআনের হেদায়াতনামা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে যার যার সুযোগ সুবিধা মতো পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। হেদায়াতনামার এ দাওয়াত অন্য লোকদের মধ্যে পৌঁছে দেয়াই হলো, আমাদের কাজ। এ কাজে সফলতা লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওফীক কামনা করছি। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্।

**সমাপ্ত**

ISBN : 984-32-1681-5 set